পাখি ও পতঙ্গরা যখন মানুষ ছিল

হরিপদ দত্ত

ছবি : হাশেম খান

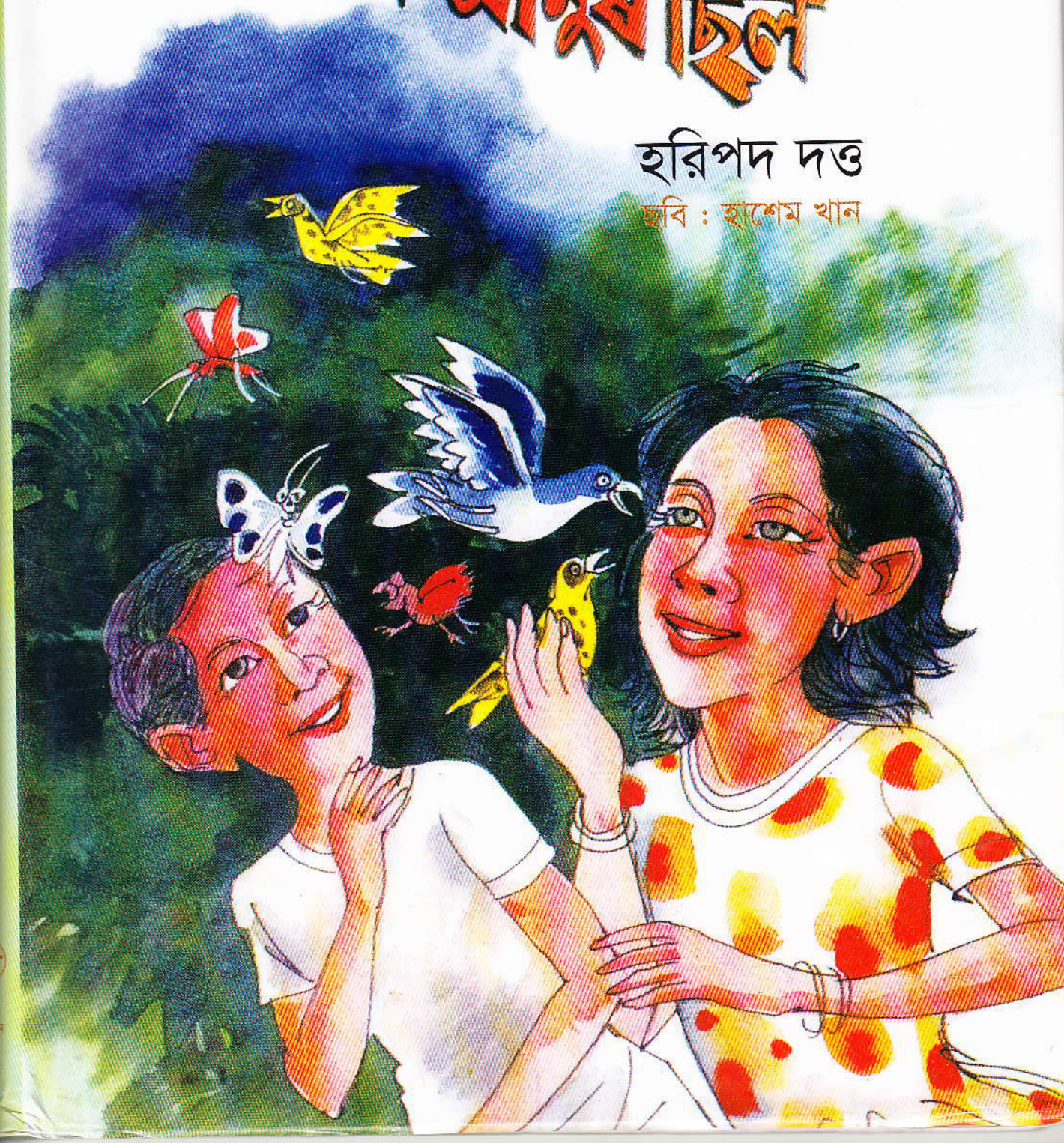

পাখি ও পতঙ্গরা যখন মানুষ ছিল

হরিপদ দত্ত

বইনকশা : হাশেম খান

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে : শিশুসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

বর্ণায়ন

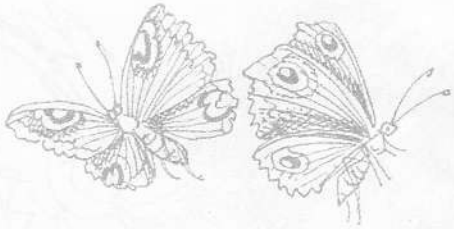

পাখি ও পতঙ্গরা যখন মানুষ ছিল

হরিপদ দত্ত

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৩

প্রকাশক
কে. এম. লিয়াকত
বর্ণায়ন
৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও বইনকশা
হাশেম খান

অক্ষর বিন্যাস
জীবন কম্পিউটার
৩৮/২খ তাজমহল মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৬, শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

ISBN-980-587-069-9

উ ৎ স র্গ

মৌমিতা রায় পূর্ণা
অন্তরা রায় প্রজ্ঞা
স্নেহাস্পদেসু

বহুদূরে হারিয়ে গেছে আমার ছোট্ট বেলার
মায়ের মুখে গল্প শোনার স্বপ্নের সন্ধ্যাগুলো।

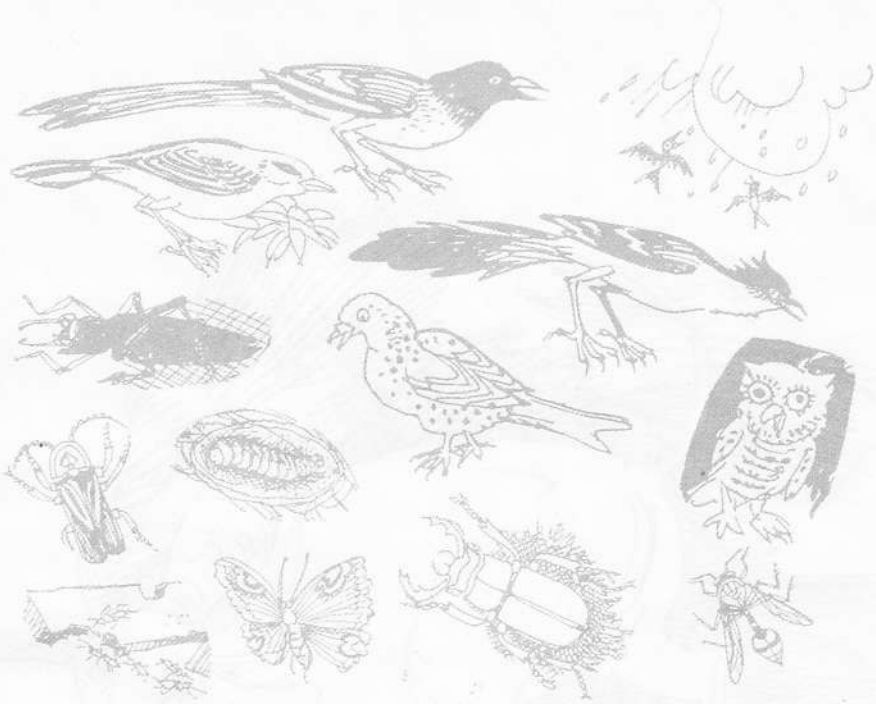

সূ চি প ত্র

কেমন করে মানুষ হলো পাখি ও পতঙ্গ ৭

পাখি

ইষ্টিকুটুম ৯
ঘুঘু ১২
চৈতার বৌ (বৌ কথা কও) ১৫
হাঁড়িচাঁচা ১৮
চাতক ২০
প্যাঁচা ২২

পতঙ্গ

জোনাকী ২৪
কুমরেপোকা ২৭
ঘুণপোকা ৩০
গুবরেপোকা ৩২
প্রজাপতি ৩৪
গুটিপোকা ৩৭
ঝিঁঝিপোকা ৩৯

কেমন করে মানুষ হলো পাখি ও পতঙ্গ

'শোন শোন গাঁও-ময়ালের বাঁদর ছেলেগণ
বনের পক্ষী-পাখলার জনম কথা করিব বর্ণন।'

এমনি ছড়া কেটে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নির্জন মাঠে ডেকে নিয়ে যে মানুষটি আমাকে ছোটকালে বনের পাখির জন্মাকাহিনী শুনিয়েছিল তাঁর কথা আজও মনে পড়ে। অবশ্য মা, ঠাকুরমা, বড়দি ও ছোড়দির মুখেও একই কাহিনী শুনেছি, কিন্তু ওই লোকটার বলার ভঙ্গি ছিল আলাদা। তো কোথা থেকে এসেছিল সেই অচেনা লোকটি, কোথায় তাঁর ঠিকানা, আজ আর তা মনে নেই। তামাটে বরন চুল আর চোখ, খাটো মতো চেহারার কালো বর্ণের সেই মানুষটির পেশা ছিল পাখি হত্যা। আজ আমি অনুমান করতে পারি, হয়তো সে ছিল শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌকায় ভেসে বেড়ানো যাযাবর বেদেদের কেউ। আমাদের গ্রামটি ঢেউ খেলানো লাল মাটির উচুঁ-নিচু টেঙ্গর বা মাঠে পূর্ণ। খুবই হালকা বসতির গ্রাম। সেইসব দিনে এবাড়ি থেকে ওবাড়ির দূরত্ব এতটা ছিল যে, সন্ধ্যা নামলে কেউ আমরা খোলা নির্জন মাঠে বা অন্য বাড়িতে একাকী যেতে সাহস পেতাম না। এমনি নির্জন গ্রামের নির্জন দুপুরে, সেই অজানা লোকটির মুখে বনের পাখিদের জন্মকাহিনী শুনে উদাস মন হারিয়ে যেতো— যে যুগে পাখিদের জন্ম, সেই অচেনা যুগে। কখনো কখনো ভাবতাম, যে মানুষটি এত দরদভরা গলায় বনের পাখির জন্মকথা শোনায়, কী করে সে পারে ওদের হত্যা করতে! মায়া হয় না?

মানুষটির কাজ ছিল গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে গাছের আড়ালে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকা প্যাঁচা ধনুক দিয়ে মেরে ফেলা। শক্ত মাটি দিয়ে ছোট ছোট গুলি বানাতো সে। ধনুক তুলে নিশানা করে ছুঁড়ে মারতো প্যাঁচাকে। দু'টি প্যাঁচা হত্যার বিনিময়ে এক সের চাল। গাঁয়ের মানুষ বিশ্বাস করে ঘরের চালে বসে কিংবা বাড়ির পাশের গাছের ডালে বসে প্যাঁচা ডাকলে গৃহস্থের অমঙ্গল ঘটে। শৈশবে এ বিশ্বাস আমারও ছিল। সন্ধ্যা-রাতে বাড়ির পাশের আম গাছে বসে লক্ষ্মী-প্যাঁচা ডাকলে, লোহার তৈরি রান্নার খুন্তি বা হাতা উনুনের আগুনে লাল করে উঠোনে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর ঘুরাতাম আর প্যাঁচাকে তাড়ানোর জন্য গলা ছেড়ে ছড়া কাটতাম :

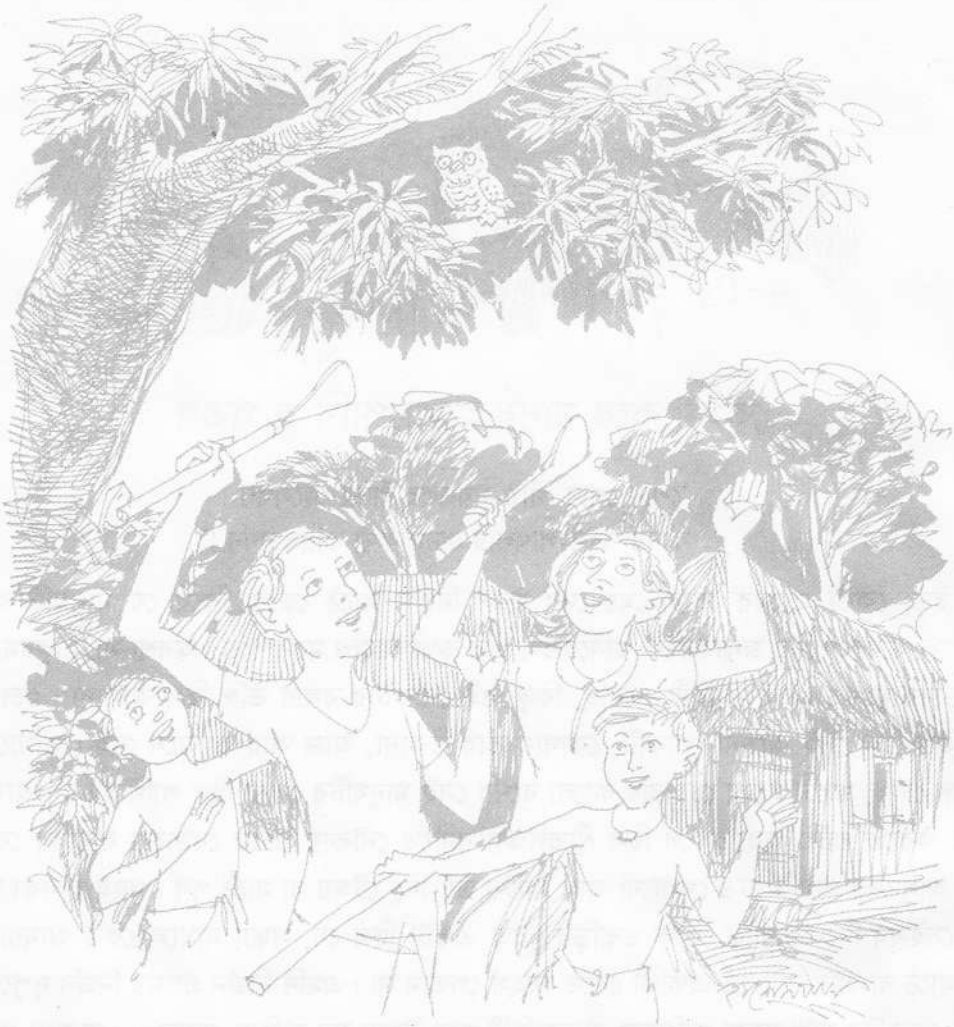

'প্যাঁচা রে প্যাঁচা
কলকি নাচা,
চুপ কর প্যাঁচা
খাবি লোহার খোঁচা।'

সেই প্যাঁচার জন্মের কাহিনী আছে। অন্যসব পাখিদেরও তাই। গল্পগুলো পড়ে তোমরা সেসব পাখিদের স্বচক্ষে দেখে যাচাই করতে পারবে আসলেই ওরা প্রাচীন যুগে মানুষ ছিল কিনা। কেবল কী পাখি? প্রজাপতি, ঝিঁঝিপোকাদের মত পতঙ্গদেরও রয়েছে কত না তাজ্জব করা জন্ম কথা। চল এখন শোনা যাক সেসব বৃত্তান্ত।

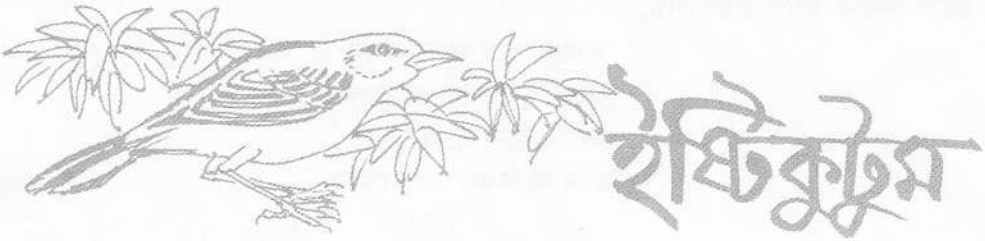

মাঘ গিয়ে আসে ফাল্গুন। মাঠে নেই কাজ। কৃষক-পিতা ভাবে, এই তো সুযোগ মেয়ের বাড়ি বেড়িয়ে আসার। সেই কবে অঘ্রানের নবান্নের সময় মেয়েটা এসেছিল! নিজে গরিব, বিয়েও দিয়েছে গরিব ঘরে।

সকালে রওনা করে দুপুর নাগাদ মেয়ের বাড়ি পৌঁছে যায় মানুষটা। পিতাকে দেখে মেয়ের কী যে আনন্দ! ছনের চালা ঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে দেয়, মেটে-ঘটিতে দেয় হাত-পা ধোয়ার জল। আজ মনের মতো করে এটা-ওটা রেঁধে খাওয়াবে বাবাকে। তবে না হবেন বাবা খুশি! বাঁশের লগা দিয়ে কুয়োতলার গাছ থেকে তুলে আনে বকফুল। বাবার বড় প্রিয় বকফুলের তেলেভাজা বড়া।

চালের মেটে-ভাঁড়ে হাত দিয়ে মেয়ে তো অবাক! এক কণা চালও নেই। এখন উপায়? চুপিচুপি স্বামীকে তাই বলে পড়শীদের কাছ থেকে একসের চাল ধার করে আনতে। যাবার আগে স্বামীকে সাবধান করে দিয়ে বলে, 'লুকিয়ে এনো। বাবা টের পেলে লজ্জায় মরণ আমার।'

মেয়ের বর গামছা কাঁধে বেরিয়ে যায় চালের সন্ধানে। মনের সুখে হেঁশেলে গিয়ে মেয়ে বসে যায় লঙ্কা আর হলুদ বাটায়। শিলনোড়ার শব্দ শোনে কৃষক পিতা ভাবে, বড় যত্ন করে নানা পদ দিয়ে খেতে দেবে লক্ষ্মী মেয়ে তার। এতে মেয়েরও সুখ, নিজেরও শান্তি!

বেলা গড়িয়ে যায়। ওদিকে বরের চাল নিয়ে ঘরে ফেরার নাম নেই। হলো কি লোকটার? হেঁশেলের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বারবার পথের দিকে তাকায় মেয়ে। এদিকটায় হলো কী, কেউ তাকে এক মুঠো চাল ধার দেয় না। আকালের মাস। পড়শীরা জানে ধারে দেয়া চাল এ সময় ফেরত আসে না। তাই শূণ্য হাতে কেমন করে ঘরে ফিরবে মেয়ের বর? দুঃখে-লজ্জায় বনের পাশে বসে থাকে সে। সে জানে না শ্বশুর-কুটুম কী ভাবছে!

এক সময় ক্ষুধার্ত কৃষক মেয়েকে ডেকে বলে, 'মা তোর রান্না হলো? কত পথ হেঁটে এসেছি, বড় ক্ষুধা পেয়েছে রে!'

শুকনো গলায় মেয়ে উত্তর দেয়,

'শাক রেঁধেছি
ডাল রেঁধেছি
ভাত কেবল বাকি।
বাবা এলেন ঘরে
মেয়ে কী দেবে
চোরের মতো ফাঁকি?'

দাওয়া থেকে ক্ষুধার্ত কৃষক উত্তর দেয়,

'বাবার পেটে জ্বলে আগুন
মেয়ের চুলায় নিভে আগুন।
মেয়ের বচন উচ্ছে তিতে
জানি না কখন দেবে খেতে।'

বেলা গড়িয়ে যায়। সূর্য হেলে পড়ে। মেয়ে বুঝতে পারে আজ আর চাল নিয়ে ঘরে ফিরবে না মানুষটা। নিশ্চয়ই চাল যোগাড় করতে পারেনি। তাই সে মনের দুঃখে ছেঁড়া শাড়ির আঁচলে মোছে চোখ। পিতার প্রতি গোসা করে মনে মনে বলে, 'আক্কেল দেখ বাবার! এমন আকালের মাসে কুটুম হয়ে কেউ বুঝি গরিব মেয়ের ঘরে আসে?'

সন্ধ্যার ছায়া নামে উঠোনে। মনের দুঃখে হেঁশেলে বসে মেয়ে কাঁদে আর ভাবে, এ পোড়ামুখ কেমন করে দেখাবে পিতাকে? তার চাইতে ভালো রূপ বদল করে পাখি হয়ে পালিয়ে যাবে বনের ভেতর। তখন চোখের জলে ভেসে ভেসে শিলনোড়া থেকে বাটা হলুদ তুলে নেয় হাতে। সারা গায়ে মাখে সব। মুখে মাখে বাটা লঙ্কা। রান্নার তেলটুকু ঢালে মাথায়। শেষে কালো-বরন শূন্য ভাতের হাঁড়ি মাথায় তুলে, ইষ্টিকুটুম পাখি হয়ে হেঁশেলের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উড়ে যায় ফুড়ুৎ করে। আর সেই পাখি ঘরের পাশের লিচু গাছের ডালে বসে ডেকে ওঠে, 'ইষ্টিকুটুম! ইষ্টিকুটুম!'

তোমরা দেখবে বাড়িতে যদি মেহমান -কুটুম আসে তার পূর্বেই গাছে বসে হলদে পাখিটি ডেকে ডেকে তার সংবাদ জানিয়ে দেয়। যদি ডাকে ঘরের চালের ওপর গাছের ডালে বসে, কোন না কোন মেহমান বাড়ি আসবেই। জনম দুঃখী গরীব বাপের মেয়ে পাখি হয়ে এভাবেই নিজের দুঃখকে প্রকাশ করে।

ঘুঘু

সাত বছরের মেয়েটাকে দুনিয়ায় ফেলেরেখে মা গেলো মরে। দুঃখের শেষ নেই মেয়ের পিতা কৃষকের। কে রান্না বান্না করে, কে যায় মাঠে। কষ্ট ঘোচাবে ভেবে নতুন বৌ ঘরে আনে কৃষক। হিংসুটে বৌ কেবল ঠোকাঠুকি করে মা-মরা সতীন ঝিয়ের সঙ্গে। বছর ঘুরতেই বৌয়ের কোলে আসে সন্তান। আর যায় কেন! ছেলে পেয়ে অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না ওর। ছেলের মা বলে কথা!

একদিন স্বামীকে ডেকে বৌ বলে, 'তুমি যে কেবল মেয়ে মেয়ে করো, শেষ জীবনে কে দেখবে বাপ-মাকে, বলো? মেয়ে তো যাবে পরের ঘরে।'

সত্যি তো! কৃষক এমনি করেই ভাবে। তাই সে একবারের জন্যও মা-মরা মেয়ের দিকে ফিরে তাকায় না। যত্ত সোহাগ ছেলেকে নিয়ে। ছেলে নয় তো সাতরাজার ধন। সুযোগ পেয়ে সৎমা অকারণেই গাল দেয় আর হাত তোলে মেয়ের গায়ে। প্রতিবাদ করার সাহস পায় না মেয়ে। গোপনে কাঁদে মৃতা মাকে মনে করে আর গুনগুন করে ছড়া কাটে ঃ

'খৈ খৈ শালিধানের খৈ
মা মরলে বাপ হয় তাওই।'

অবসর নেই। সারাদিন কেবল ফরমাস খাটায় সৎমা। এত করেও সৎমায়ের মন পায় না মেয়ে। একেই বলে পোড়া কপাল।

আসে আশ্বিনের লক্ষ্মীপূজার দিন। গড়তে হবে তিলের নাড়ু। এক সের তিল মেপে কুলোয় তুলে সৎমা সতীন ঝিকে ডাকে ঃ

'রাজার ঝি গো, রাজার ঝি
ঘরে বসে করিস কী?
বসে বসে কত খাবি
শুয়ে শুয়ে ঘুম যাবি।
সাবাড় করলি খেয়েদেয়ে
বাপের গোলার বিন্নিধান।
তিল চুড়ে উদ্ধার কর
সতীন মায়ের প্রাণ।'

কুলোর উপর হাত ঘষে ঘষে কালো তিল সাদা করতে করতে পুবের বেলা পশ্চিমে যায়। মেয়ের পেটে ভাত কেন, এক কণা খুদও পড়েনি সারাদিন। ক্ষুধায় প্রাণ যায় যায় সতীন ঝিয়ের। আপন মাকে মনে পড়ে ওর। ও শুনছে মৃতা মা ঘুমের মাঝে স্বপ্নে এসে মেয়ের দুঃখের কথা শোনে আর আদর করে যায়। কই, ওর মা তো কোন রাতে স্বপ্নে এলো না! দু'চোখে জল গড়ায় সতীন ঝিয়ের।

এক সময় তিলের কালো খোসা ওঠে গিয়ে সাদা হয়ে যায়। সৎমা এসে মেপে দেখে এক সের তিল তিন পোয়া হয়ে গেছে। আর যায় কেন, সতীন ঝিয়ের চুলের মুঠো ধরে মারতে মারতে বলে, 'রাক্ষুসী মেয়ে, লক্ষ্মীদেবীর নাড়ুর তিল খেলি কেন? জলদি ওজন পুরে দে।'

মেয়ে কেঁদে-কেটে কত কথা বলে। সে জানায় হাতের ঘষায় কিছু তিল ভেঙে গেছে আর খোসা ছাড়ালে ওজন কমে যায়। মানতে রাজি নয় সৎমা। কুলো তুলে সতীন ঝিয়ের মাথায় দেয় শক্ত আঘাত। সাথে সাথে রক্তবমি করে মৃত্যু ঘটে অভাগী মেয়ের।

এখন খুনি সৎমা করবে কী? কৃষকের মাঠ থেকে ফেরার সময়ও আসছে ঘনিয়ে। হঠাৎ ওর মাথায় খেলে এক বুদ্ধি। সেই মতে গোয়ালের পেছনে কোদাল দিয়ে গোবর স্তূপে গর্ত তৈরি করে। সেই গর্তে সতীন ঝিয়ের লাশ তাড়াতাড়ি পুঁতে ফেলে। চালাকি করে গোবর চাপা লাশের ওপর রোপণ করে মর্তমান কলার একটি চারা।

একটু পরেই ঘরে ফিরে আসে কৃষক। মেয়েকে কোথাও দেখতে না পেয়ে খোঁজ নেয়। স্বামী প্রশ্ন করতেই সৎমা জানায়, 'রাক্ষসী মেয়ে লক্ষ্মীপূজার তিল চুড়তে গিয়ে খেয়ে নিয়েছে আধাআধি। শাসন করেছি বলে গোসা করে মরা মায়ের বাপের বাড়ি চলে গেছে। এখন জেদ কত বুঝ?'

স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে কৃষক। রাগ করে বলে, 'ওই বাড়ি খাবে কী? ওদের জোটে না ছাতু, খেতে দেবে কী ছাই?'

মনে মনে কৃষক বৌ বলে, যাক, রক্ষা পাওয়া গেলো!'

মাসের পর মাস যায়। হারিয়ে যাওয়া মেয়ের কোন সংবাদ নেয় না কৃষক। এভাবে বছর ঘুরে বর্ষা এলে কলাগাছে নামে কাঁদি। শরতে বর্তমান কলায় ধরে রঙ। কৃষক দা হাতে কাটতে যায় কলার কাঁদি। যেই না কাঁদিতে রাখে হাত, অবিকল সেই হারানো মেয়ের স্বরে কথা বলে ওঠে কলাগাছ ঃ

'আগায় ধরো না বাবা
আগা করে থরথর।
গোড়ায় ধরো না বাবা
গোড়া করে থরথর।
সৎমা করলো খুন
গোবর তলায় ঘর।
কোজাগরী আসবে বাবা
আর কতদিন পর?'

কৃষক তো অবাক! কে কথা বলছে? কোথায় সে? এ যে তার মা-মরা মেয়ের গলা! পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীর কাছে সে জানতে চায়, ঘটনা কি।

স্ত্রী ভয় পেয়ে সব ফাঁস করে দেয়। কৃষকের বুকে জ্বলে ওঠে আগুন। দা দিয়ে এক কোপে দু'ফালা করে দেয় স্ত্রীর গলা। দেহ ছেড়ে স্ত্রীর প্রাণ উড়ে যায় পাখি হয়ে। সেই পাখির সারা গায়ে কালো তিলের ফোঁটা। আকাশে এক চক্কর দিয়েই পাখিটি ফিরে এসে বসে কলাগাছের মাথায়। সে করুণ সুরে ডেকে ওঠে, 'সতীন ঝি গো, পুর ... পুর... পুর...।'

চৈতার বউ
(বউ কথা কও)

আকাশে নেই মেঘ। মাসের পর মাস কাটে অনাবৃষ্টিতে। জমিতে নেই ধান আর কাউন। গৃহস্থের ভাঁড়ে নেই চাল আর ছাতু। আকাল নামে দেশে। চারদিকে শুরু হয় হাহাকার। এমনি দিনে রাজার লোক ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে যায়, 'রাজ-কর দাও, রাজ-কর দাও।'

মানুষ কেমন করে দেবে রাজ-কর? একেই বলে মড়ার ওপর খাড়ার ঘা! পেটের জ্বালায় জংলী কুঁচ খেয়ে সাবাড়। সেই কঁচুর খোঁজে বেরিয়ে বেলা গড়িয়েও ঘরে ফেরার নাম নেই চৈতার। কোলের শিশুকে নিয়ে কেবলই ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে বৌ। তিন দিন-তিন রাত পর চৈতার বৌ সংবাদ পায় বনের ভেতর কঁচু খুঁজতে গিয়ে ক্ষুধার জ্বালায় মরে গেছে চৈতা। সেই লাশ খেয়েছে শকুন আর শেয়ালে।

ক্ষুধার এতই জ্বালা, এখন চৈতার বৌ স্বামীর শোক ভুলে কোলের শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় খোঁজে। কেমন করে বাঁচাবে? নিজে খেতে পায় না বলে বুকের দুধও গেছে শুকিয়ে। অনাহারী শিশু কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন না খেয়ে থেকে থেকে পেটের সন্তানের প্রতিও মায়া-মমতা ফুরিয়ে আসে চৈতার বৌয়ের। সে শুনছে পেটের ক্ষুধা সইতে না পেরে গ্রামের মেয়েরা দূরের হাটে নগদ কড়িতে বিক্রি করে দিচ্ছে শিশুদের। মিছে ভেব না কথাটা। এক কালে আমাদের দেশে মানুষ কেনা-বেচা হতো।

সেই মানুষ কেনা-বেচার হাটের উদ্দেশ্যে চৈতার বৌ আধ-মরা শিশুকে বুকে জড়িয়ে রওয়ানা হয়। হাঁটতে হাঁটতে বেলা গড়িয়ে তবেই সে হাটে এসে পৌঁছে। ভিনদেশী সওদাগরেরা ভিড় করেছে হাটে। কেউ কিনছে শিশু, কেউবা যুবতী নারী। ক্রেতার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চৈতার বৌ লক্ষ্য করে, আঁচলে ঢাকা শিশুর শরীর শীতল। বুঝতে পারে শিশুটি মরে গেছে। এখন কেমন করে চাল কিনবে সে? তাই সে ফন্দি আঁটে। সুর তুলে ছড়া কেটে বলে :

'রাজার ছেলে, রানীর ছেলে
মায়ের দুধের নেশায় পেলে
ঘুম ভাঙ্গে রাত পোহালে।
দিন যাবে হেসে-খেলে
নেচে যাবে ফুলে ফলে
বেচতে পারি দশ কড়ি পেলে।'

দশ কড়ি নয়, পাঁচ কড়ির বিনিময়ে চৈতার বৌ চালাকি করে মরা শিশুকে বিক্রি করে দেয়। সেকালে কড়ি দিয়েই কেনা-বেচা হতো। টাকার প্রচলন ছিল না। সেই কড়ি দিয়ে পাঁচ মুঠি চাল, ভাঙ্গা খুদ, আর পচা ছাতু কিনে হাট থেকে বেরিয়ে আসে চৈতার বৌ। দ্রুত হাঁটে সে। পাছে ধরা পড়ে মরা ছেলে বিক্রির অপরাধে।

হাঁটতে হাঁটতে এক বনের ধারে এসে ক্ষুধায় আর ক্লান্তিতে গাছতলায় বসে পড়ে। এবার সে ছেঁড়া শাড়ির আঁচল খুলে মুঠো ভরে পচা ছাতু খেতে খেতে ছেলের কথা ভাবে। চোখের জলে বুক ভাসে তার। বিড়বিড় করে চৈতার বৌ বলে :

'মরা ছেলে, মরা ছেলে
রাজকন্যার বর,
স্বপ্নে এসে দেখে যাস
দুঃখিনী মায়ের ঘর।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। অবশিষ্ট খুদ আর ছাতু আঁচলে বেঁধে বাড়ির পথে পা ফেলে চৈতার বৌ। খানিকটা হেঁটে বটগাছের তলায় বসে পড়ে সে। পচা ছাতু খাওয়ার ফলে ফেঁপে উঠেছে পেট। বন্ধ হয়ে আসছে দম। হঠাৎ সে শুনতে পায় পেছন থেকে ভেসে আসা সওদাগরের ডাক, 'ও চৈতার বৌ, তোর মরা ছেলে ফেরত নিয়ে কড়ি ফিরিয়ে দে।'

চোখ বুঁজে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চৈতার বৌ। লম্বা দম ফেলে মৃত্যুবরণ করে সে। মিথ্যে বলে মৃত সন্তান বিক্রি করার পাপে তার আত্মা পাখি হয়ে যায়। সেই পাখি চৈতার বৌয়ের মৃতদেহের ওপর দিয়ে উড়তে থাকে আর উচ্চস্বরে ডাকে ঃ

'চৈতার বৌ গো
কড়ি দে গো
ছেলে নে গো।'

SEQAEP

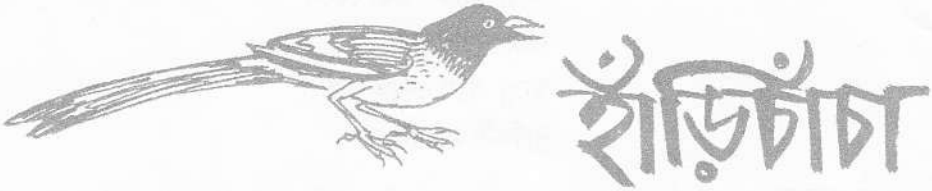

গাঁয়ের মানুষ তাকে ডাকে হাঁড়িচাঁচা নামে। ক্ষুধা পেলে রক্ষা নেই। হাঁড়ির ভাত চেঁচে-চেঁচে না খাওয়া অবধি থামার নাম নেই। লোকটা রাক্ষস বটে। সেই হাঁড়িচাঁচা প্রতিদিনের মতো আজও রাত পোহালে মাঠে হাল নিয়ে যেতে যেতে ছেলেকে ডেকে বলে যায়, 'দুপুরবেলা ভাতের হাঁড়ি নিয়ে মাঠে যাস। দ্যাখিস দেরি করবি না কিন্তু!'

এদিকে বৌ উনুনে হাঁড়ি চড়াতে গিয়ে দেখে ভাঁড়ে চাল নেই। এখন উপায়? ক্ষুধা পেলে যে লোকটার হুশ থাকে না। তাই চটজলদি গোলা থেকে ধান নামিয়ে সিদ্ধ করতে বসে। সেদ্ধধান উঠোনে শুকোতে গিয়ে টের পায় বেলা বাড়ছে। বদরাগী স্বামীর ভয়ে আধা-সেদ্ধ ধান তুলে দেয় সে ঢেঁকিতে। দম বন্ধ করে সে যখন ধান ভানতে থাকে তখন মাথার উপর দুপুরের সূর্য। ধান ভানা শেষ করে এক সময়ে চাল চড়িয়ে দেয় ভাতের হাঁড়িতে। সেই চাল ভাত হতে হতে বেলা আরো গড়ায়। কে জানে আজ কপালে ওর কী আছে।

কালো হাঁড়ি ভরে পিতার জন্য ভাত আর মরিচ বাঁটা নিয়ে মাঠের দিকে পা বাড়ায় হাঁড়িচাঁচার কিশোর ছেলে। এদিকে ক্ষুধায় পেটের ভেতর আগুণ জ্বলছিল হাঁড়িচাঁচার। দূর থেকে ছেলেকে দেখতে পেয়ে মাথায় রক্ত ওঠে যায় তার। অকারণে গরুর পিঠে পাচনের ঘা মারতে মারতে বিড়বিড় করে বলে ঃ

'পুত, পুত, শত পুত
ভালো নয় তো যমের দূত।
যমের পিছে সাত ভূত
তার পিছে চাষার পুত।'

জমির আলের পাশে ন্যাড়া হিজল গাছের নিচে এসে দাঁড়ায় ছেলে। ক্ষুধার্ত পিতার মেজাজ দেখে ভয় পেয়ে যায় সে। হাল থামিয়ে বাঁশের পাচনি হাতে এগিয়ে এসে চড়া গলায় হাঁড়িচাঁচা ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, 'এত দেরি কেন?'

ভয়ার্ত ছেলে মায়ের চাল না থাকার কথা জানায়। আরো জানায় মায়ের ধান সেদ্ধ করার কথা, ভানার কথা। এসব বিশ্বাস করে না হাঁড়িচাঁচা। উত্তেজিত হয়ে পাচনি দিয়ে ভীষণ জোরে আঘাত করে ছেলের মাথায়। চিৎকার দিয়ে চষা জমির ওপর লুটিয়ে পড়ে অভাগা ছেলে। মাথা ফেটে বইতে থাকে রক্তের স্রোত। ছটফট করে একসময় মরে যায় ছেলেটা। মৃতছেলের রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে

যায় হাঁড়িচাঁচা। একি করলো রাগের মাথায়! ছেলের লাশের ওপর লুটিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করতে থাকে সে, 'এই কি করলাম, তোকে আমি খুন করলাম পুত!'

একসময় মনের আক্ষেপে ছেলের তাজা রক্ত আপন শরীরে মাখতে থাকে হাঁড়িচাঁচা। সারা শরীর হয়ে যায় রক্তবর্ণ। হাঁড়ির ভাত ঢেলে দেয় হিজল গাছের গোড়ায়। বাটা মরিচ চোখে মেখে দিলে চোখের বর্ণ হয় লাল। তখন ভাতের পোড়া কালো হাঁড়ি মাথায় নিয়ে পাখি হয়ে হাঁড়িচাঁচা পাশের ঘন বাঁশ বনে ঢুকে যায়। বাঁশবনের অন্ধকারে সেই পাখি ডেকে ওঠে ঃ 'হা পুত ... পুত ... পুত... ।'

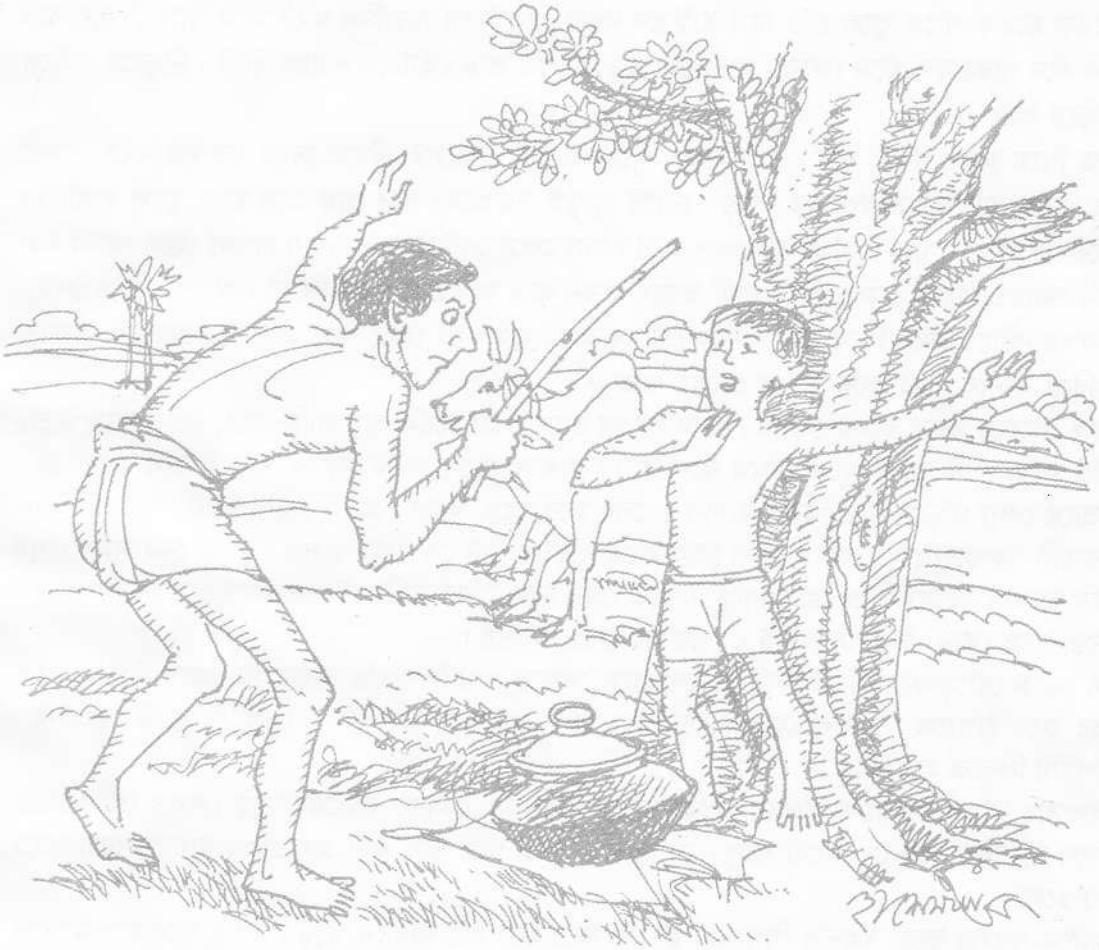

চাতক

গরিব চাষা। ঘরে পাঁচ ছেলে, ছয় মেয়ে। এতগুলো মুখের খোরাক যোগাবে কেমন করে? খেয়ে, না খেয়ে দিন যায় ওদের। তাই মনের দুঃখে ছোট ছেলেকে দূর গাঁয়ে বড় গৃহস্থের ঘরে পাঠিয়ে দেয় গরু রাখালের কাজে। ওখানেও পেট পুরে খেতে পায় না রাখাল ছেলে। হিংসুটে গৃহস্থের বৌ প্রয়োজনের অর্ধেক ভাতও পাতে তুলে দেয় না। তাই সে গরুর পাল নিয়ে সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায় আর বনে বনে পাকা ফল খুঁজে ফেরে। গরুগুলো বড় অনুগত তার। হাঁটতে কইলে হাঁটে। দাঁড়াতে কইলে দাঁড়িয়ে থাকে।

শীত গিয়ে আসে খরার মাস। তাই মাঠে মিলে না ঘাস। ঘাসের খোঁজে যেতে হয় দূর মাঠে। বেলা যত বাড়ে রোদের তাপও তত বাড়ে। রোদে পুড়েই গরুগুলো ঘাস খায় আর মাথা তুলে রাখালের দিকে তাকিয়ে পিপাসার কাতরতা প্রকাশ করে। ঘাস খেয়ে পেট না ভরা অবধি রাখাল ছেলে ওদের জল পান করাতে নারাজ। জল খেয়ে পেট ভরলে তখন আর ঘাস খেতে চাইবে না। আগে ভরুক পেট। তারপর নদীতে নিয়ে গিয়ে জল পান করিয়ে আনবে। ততক্ষণে বেলা পড়ে এলে গরুগুলোকে বাথানে ফিরিয়ে আনবে। এই হচ্ছে রাখাল ছেলের কাজ।

আজ পেয়েছে তাকে বনের নেশায়। কোন্ গাছের ডালে কাঠবেড়ালি লাফালাফি করে, কোন্ গাছে উড়া-উড়ি করে পাখি তা-ই খুঁজে ফেরে বনে বনে। রাখাল ছেলে জানে সেসব গাছেই ফল পেকেছে। এভাবে বেলা গড়িয়ে যায়। হঠাৎ রাখাল ছেলের মনে পড়ে, আজ তো সে নদীর ঘাটে নিয়ে জল পান করায়নি গরুগুলোকে। অথচ বেলা ডুবে যাচ্ছে। নদীর ঘাট সে তো বহু দূর। হাতে নেই সময়। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। বাথানে গরু রেখে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে মনিব লাঠিপেটা করে তাড়িয়ে দেবে তাকে। ধারে-কাছে কোন জলাশয়ও নেই। খরায় সব গেছে শুকিয়ে।

বন থেকে দৌড়ে এসে মাঠে ফিরে রাখাল ছেলে দেখতে পায় পিপাসায় কাতর গরুগুলো দাঁড়িয়ে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। রাখাল ছেলের বড় মায়া হয়। কান্না আসতে চায়। কিন্তু কোন উপায় নেই। শিগগির ফিরতে হবে বাড়ি।

পিপাসায় কাতর গরুগুলো বাথানে ঢুকিয়ে রাখাল ছেলে ফিরে আসে মনিবের বাড়ি। গরুর খোঁজ নিতে গেলে মনিবের সঙ্গে সে মিথ্যে বলে। সে জানায়, পেট পুরে ঘাস আর জল খেয়ে বাথানে শুয়ে আছে গরুগুলো।

এদিকে পালের বুড়ো বলদটা পিপাসায় ছটফট করে মরে যায় বাথানে পড়ে। মরার পূর্বে মনের দুঃখে রাখাল ছেলেকে অভিশাপ দিয়ে যায় সে। অভিশাপ দেয়, অকালে রাখাল ছেলের হবে মরণ। মানুষ হয়ে নয়, পরজন্মে সে হবে চাতকপাখি। পিপাসায় কাতর হয়ে সেই পাখি মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে উড়ে বেড়াবে আকাশে। নদী আর পুকুরের জল কোনদিন পান করতে পারবে না সে। তার ঠোঁট থাকবে

আকাশের দিকে উচুঁ হয়ে। বৃষ্টি ভিন্ন পিপাসায় কোথাও পাবে না সে এক ফোঁটা জল। এখন বুঝ পাপের কি সাজা!

পিপাসায় কাতর গরুর অভিশাপে অকালে মৃত্যু ঘটে রাখাল ছেলের। চৈত্রের খরার দিনে চাতক পাখি হয়ে জন্ম নেয় রাখাল ছেলে। চাতকপাখি পিপাসায় বুক-ফাটা আর্তনাদ করে উড়ে মেঘ-শূন্য আকাশে। কবে যে আসে বর্ষা! উড়ন্ত চাতকের ঠোঁট উঁচু হয়ে থাকে উর্ধ্বে। তার পিপাসা-করুণ বিলাপের সুর ভেসে বেড়ায় বৃষ্টিহীন আকাশে-বাতাসে।

'দে জল, দে জল, জল দে
মেঘ দে, বৃষ্টি দে, জল দে।'

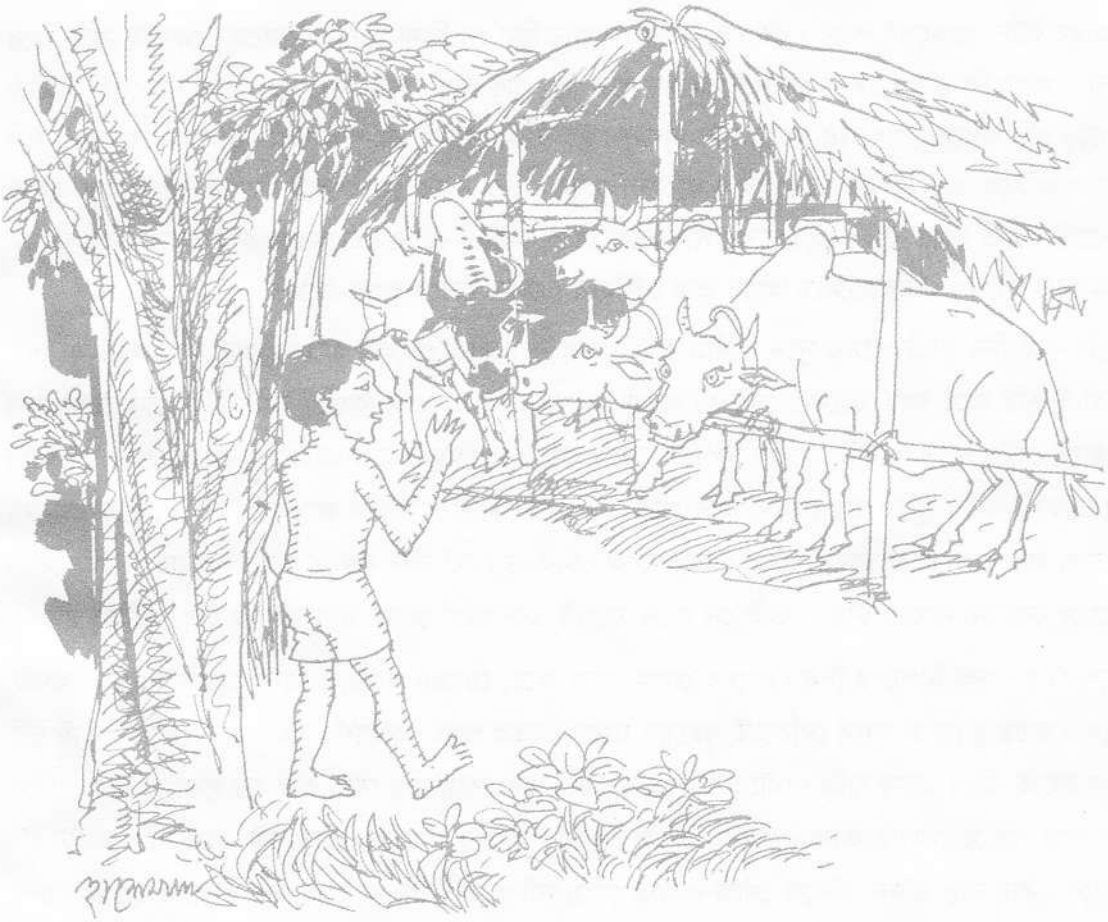

প্যাঁচা

সব পাখিকে তোমরা ভালবাসবে তেমন কিন্তু নয়। কাক বা প্যাঁচাকে মোটেই ভালবাস না। কেন বলতো? ওই যে ওদের স্বভাব-চরিত্র। সেই চরিত্র দোষের কারণেই মানুষ হয়ে গেল প্যাঁচা। তবে শোনা যাক সে কথা।

মানুষ গরীব থাকতেই পারে। ওই যে গরীব লোকটা ছিল সে কিনা আবার আলসে। মোটেই কাজ করে না। খাবে কি করে? চলবে কোন উপায়ে? সহজ পথ, চুরি করা। সারা দিন ঘুম। রাত নামলেই বেরিয়ে পড়ে চুরি করতে। গৃহস্থের ঘরের ধান-চাল-কাপড়-টাকা-পয়সা, যা পায় সবই তুলে আনে ঘরে। যদি সিঁধ কাটলো এক বাড়ির, অন্যবাড়ির কাটলো বেড়া। এত চতুর সে, সবাই সন্দেহ করে কিন্তু হাতে নাতে ধরতে পারে না। সেই চোরের সাধ হলো বিয়ে করার। বৌ'র তো অভাব নেই দেশে। দূর গাঁয়ের আরেক সিঁধেল চোরের মেয়ে আসে তার বৌ হয়ে। চোরে চোরে শ্বশুর-জামাই।

চুরি করে দিন কাটে ওদের সুখে। বৌটাও কম যায় না। ফাঁক পেলেই অন্যের কলা-মূলা-লাউ-যা পায় তা-ই চুরি করে ঘরে আনে। সেই চোর-বৌ সংসারের দেখ-ভাল করে। তাই চুরির যত টাকা সব আসে বৌ'র হাতে। বৌটা আবার কিপটে। খরচ কম করে কিছু কিছু টাকা জমায় সে। রাখবে কোথায়? চোরেরও থাকে চুরির ভয়। চোর আর চোর-বৌ কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তাই বৌটা জমানো টাকা সব গুঁজে রাখে ছনের ঘরের চালের ফাঁক ফোঁকড়ে। বৌ ঠিক বুঝতে পারে ওর চোর স্বামী জেনে গেছে কোথায় রয়েছে টাকা। তাই সে মাঝে মধ্যেই এক জাগা থেকে অন্য জাগায় টাকা সরিয়ে রাখে।

শেষটায় এলো বিপদের দিন। গাঁয়ের লোক ঠিক করে, চোরের বাড়িতে খানা তল্লাস করবে। কথাটা চোর রাতে চুরির মতলবে বেরিয়েই গৃহস্থের ঘরের ভেতর শলা পরামর্শের সময় শুনে ফেলে। তাই চুরি না করেই ফিরে আসে বাড়ি। বৌকে জানায় কথাটা। ভয় পেয়ে যায় বৌ। শুরু হয় লুকানো টাকা বাড়ির বাইরে সরিয়ে ফেলার কাজ। পোড়া কপাল। ঘরের চালের কোথাও চোর-বৌ খুঁজে পায় না টাকার থলে। বার বার এদিন ওদিকে খোঁজ করতে যেয়ে সঠিক জাগাটা সে ভুলে যায়। ঘরের ছনের চালের কোথাও টাকার থলেটা চোরও খুঁজে পায় না। এবার শুরু হয় চোর আর চোর বৌ'র বিবাদ। ওরা একজন অন্যজনকে দোষ দেয়। চোর বলে, 'তুই থুয়েছিস'। চোর-বৌ বলে, 'তুই থুয়েছিস।'

এরই ফাঁকে অসাবধানতায় চোরের বৌ'র হাতের কুপির আগুন ছনের চালে লেগে যায়। চোখের পলকে সেই আগুন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

লুকানো টাকার থলে সমেত চোর আর চৌর-বৌ পুড়ে মরে আগুনে। মরে গিয়ে চোর আর চোর-বৌ হয়ে যায় প্যাঁচা। রাত নামলেই টাকার থলের খোঁজে গৃহস্থের ঘরের ছনের চালে বসে বিবাদ করে প্যাঁচা আর প্যাঁচি ঃ

'তুই থুয়েছিস, তুই থুয়েছিস
তুই থুয়েছিস, তুই থুয়েছিস

জোনাকী

সময় মতো বৃষ্টি আর রোদ পাবার ফলে সেবার কৃষকের ক্ষেত ভরে যায় সোনার ধানে। জোয়ান ছেলেকে সঙ্গে করে কৃষক গান গায় আর ধান কাটে। বন্যা আর খরায় পরপর তিন বছর ফসল পায়নি বলে কত কষ্টে দিন গেছে তার। এ বেলা খাবার জোটে তো ওবেলা উপোস। তবু রাজার লোক ছাড়েনা। রাজকর দাও। নইলে বিনে মায়নায় রাজবাড়ি বেগার খাটো। হালের বলদ বেচে আর যে কু'মুঠো ধান পেয়েছে তা থেকেই কৃষক শোধ করেছে খাজনা। তাতেও কুলোয়নি বলে বাপ-বেটা বেগার দিয়েছে রাজবাড়ি। রাজকন্যার হরিণকে যত্ন করেছে। রাজার বাগান-বাড়ির জঙ্গল সাফ করেছে সারাটা দিন ক্ষুধা পেটে।

এবার গোলাভরা ধান। কৃষক ডেকে বলে কিষানীকে, 'ছেলের বিয়ে দিতে হয় যে এবার।'

কিষানীর জবর খুশি। হাসি হাসি মুখ করে বলে,

'মেয়ে দেখো মেয়ে খোঁজ
মাথা ভরা ঢেউ খেলানো চুল।
চোখ যেনো হয় পদ্মদীঘি
রঙ যেনো সিঁদুরে আমের মুকুল ॥'

চাইলেই তো হয় না। সেকালে পিতার ঘর থেকে পণের টাকা গুনে দিয়ে তবেই আনতে হতো নয়া বৌ। কোমর অবধি লম্বা কালো চুল, টলটলে জলের পদ্মদীঘির মতো বড় বড় চোখ আর আমের বোলের মতো সোনালী শরীরের বৌ তো আর সস্তায় মেলা না। মিললেও পণের টাকা যা দাবি করে মেয়ের বাপ, দেয়ার সামর্থ নেই কিষানের। তাই বাধ্য হয় গরীব ঘরের কালো মেয়েকে ছেলের বৌ করে ঘরে তুলতে।

বৌ পেয়ে মন ভরেনা ছেলের। মুখ ভার করে থাকে যখন তখন। যতটুকু আদর পাবার কথা তা পায় না বৌ। গায়ের রঙ কালো বলে আক্ষেপ করে আর গোপনে বসে চোখের জল ফেলে সে।

কালো ভ্রমর কালো ভ্রমর
শরীর তোর শাওন মেঘের বরন।
গুণ গুণ বলে যা কোন গুণে করলি
রাঙা ফুলের মন হরণ?

ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানো কালো ভ্রমরের দিকে তাকিয়ে কথাটা জানতে চায় কালো বৌ। ভ্রমর উত্তর দেয় না। ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় আর মধুপান করে। শাড়ির আঁচলে চোখ মোছে কালো বৌ। আদর না পেলে হলো কী, সারাটা দিন কাজ করতে হয় তাকে। বেলা গড়ালে মাঠ-গোবাট আর বেত ঝোপের বন পেরিয়ে ওই দূরের দীঘি থেকে আনতে হয় কলসি ভরে জল।

সেই দীঘির জলই হলো কালো বরণ বৌ'র কাল। বারবার যেতে হয় দীঘিতে। ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা। কলসি ভরে জল নিয়ে লম্বা পা ফেলে বৌ। পথ যেনো ফুরোয় না। বেত ঝোপে নামে সন্ধ্যার আঁধার। সেই আঁধার কেটে হাঁটে কালো-বৌ। হঠাৎ শ্বশুরের দেয়া রুপোর নাকছাবিটা টুপ করে পড়ে যায় বেত ঝোপে। কাঁখের কলসি নামিয়ে কত খোঁজে সেই নাকছাবি। বেত কাঁটার ঘাঁই লেগে হাত থেকে রক্ত ঝরে। নাকছাবিটা আর খুঁজে পায় না কালো-বৌ। কেঁদে কেঁদে বাড়ি ফিরলে সব শুনে শ্বশুর গাল পাড়ে। শাশুড়ি বাপেরবাড়ির খোটা দেয়। স্বামী তেড়ে আসে মারতে। অশান্তি আর কাকে বলে।

রাত গিয়ে দিন আসে। সারাটা দিন বেত ঝোপে নাকছাবি খোঁজে কালো বৌ। পোড়া নসিব ওর। তাই দু'দিন পর শ্বশুর তাকে তাড়িয়ে দেয় বাপের বাড়ি। গরীব বাপের মাথায় হাত। কি করবে সে? কোথায় পাবে টাকা মেয়েকে নাকছাবি গড়ে দেবার জন্য? পণের টাকা তো ততো দিনে খরচ হয়ে গেছে।

খাওয়া নেই। নাওয়া নেই। কেবল কাঁদে কালো-বৌ হারানো নাকছাবির শোকে। যেতে চায় শ্বশুরের গাঁয়ের সেই বেতঝোপে নাকছাবি খুঁজতে। কিন্তু লোকে দেখলে বলবে কি? রাত বিনে দিনের বেলা ওদিকটায় যাওয়া যাবে না। শোকে-দুঃখে বিছানা নেয় কালো-বৌ। দু'দিন পরই বাড়ি আসে এক জটাধারী সাধু বাবাজী। কালো-বৌ সাধুজীর পা জড়িয়ে ধরে কাঁদে। মন গলে সাধুর। সাধু একমুঠো ধুলো মন্ত্রপড়ে কালো-বৌ'র শাড়ির আঁচলে বেঁধে দিয়ে বলে, 'সাবধান। আঁচলের বাঁধন খুলবি না। খুললে হবে অমঙ্গল। আঁচলের ধুলো থেকে দ্যাখবি বেত ঝোপে পৌঁছলেই আলো বের হবে। সেই আলোয় অন্ধকার বেত বনে খুঁজিস নাকছাবি। প্রথম রাতে না পেলে প্রতিরাতেই খুঁজবি।'

কালো-বৌ'র মনে এবার শান্তি ফিরে আসে। সন্ধ্যা গিয়ে রাত নামলে অন্ধকার পথে একাকী নেমে আসে সে। যেই না বেতবনে প্রবেশ করে তখনই চাঁদের মতো আলো জ্বলে ওঠে আঁচলে বাঁধা ধুলো থেকে। কিন্তু পোড়া কপালী বৌ হারানো নাকছাবি পায় না তন্ন তন্ন করে খুঁজেও। আগামী রাতে পুনরায় খুঁজতে আসবে ভেবে ঘরে ফেরে কালো-বৌ। এভাবে সাত রাত নাকছাবি খোঁজা খোঁজি করে সে।

দ্যাখো কী বদনসিব বৌটার। পাড়ার কুটনি বুড়ি এক রাতে মাঠের দিকে কালো-বৌকে হেঁটে যেতে দেখেই ওর পিছু নেয়। তার সন্দেহ হয় ওকে। না হলে রাতে একাকী কোথায় যাচ্ছে শ্বশুর-তাড়ানো মেয়েটা? বেতবনে ঢুকা মাত্রই কালো-বৌ'র আঁচলে হীরকের আলো জ্বলে ওঠে। এ দৃশ্য দেখে বুড়ি তো থ! সে ভাবে মেয়েটা সাতরাজার ধন পেয়েছে। সেই ধন বেতবনে লুকোতে এসেছে। কিন্তু সে দেখে কালো-বৌ আঁচলের গেরো থেকে বের হওয়া আলোয় কি যেন তালাশ করছে। ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকে বুড়ির কাছে। তাই সে কালো-বৌ'র সামনে এসে দাঁড়ালে ভয় পেয়ে যায় সে।

সরল বিশ্বাসে কুটনি বুড়ির কাছে সব কথা খুলে বলে কালো-বৌ। বুড়ি ভাবে এই তো সুযোগ ধোঁকা দিয়ে আঁচলের যাদুর মাটি দখল করার। তাই সে নিজের নাকছাবিটা খুলে এনে কালো-বৌ'র সামনে তুলে ধরে বলে,' এই তোর নাকছাবি, এখানেই কুড়িয়ে পেয়েছি ওই সেদিন।'

যদি দিস আঁচলের ধন
পাবি ফিরে নাকছাবি এখন।
শ্বশুর পাবি, স্বামী পাবি
হেসে খেলে দিন কাটাবি।

বোকা মেয়েটা স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার আশায় করলো কী দ্যাখো। বুড়িকে জড়িয়ে কেঁদেই ফেলে আনন্দে। সেই আনন্দে আঁচলের বাঁধন খুলে ফেলে সাধুজীর বারণ ভুলে গিয়ে। ঠিক তখনই তার শরীর ঢলে পড়ে বেতঝোপে। মৃত্যুঘটে খানিক পরে। বৌ'র আত্মা হয়ে যায় জোনাকী পোকা। সেই পোকা সন্ধ্যা নামলে আজো বেতঝোপে শরীরের পুচ্ছে আলো জ্বলিয়ে খোঁজে হারানো নাকছাবি। কোন দিন কী সে তা খুঁজে পাবে? তোমারই বলো পাবে কি খুঁজে?

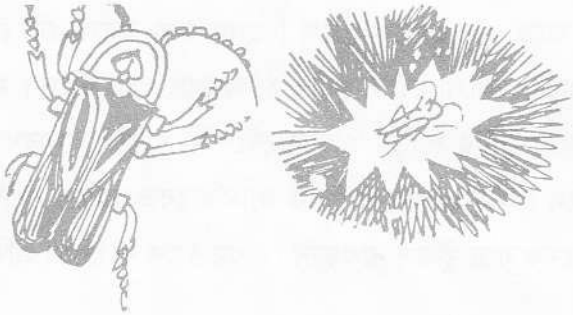

কুমরে পোকা

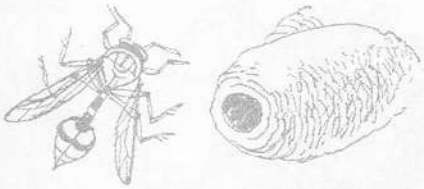

নিশ্চয়ই তোমরা কুমরেপোকা দেখেছ? না-দেখার কথা নয়। গ্রামে তো বটেই, শহরেও তাদের বসবাস। ওরা দেখতে বোলতার মতো। টেবিলে বসে মন দিয়ে অংক কষছ, হঠাৎ দেখতে পাবে জানালার ফাঁকে ভোঁ শব্দে ওই ভদ্রলোক তোমার ঘরে ঢুকে গেছে। পায়ে বা মুখে একদলা মাটি। বলা নেই কওয়া নেই তোমাদের লাখ-লাখ টাকা খরচ করা ঘরে কিংবা হাজারে বিজারে টাকায় ভাড়া নেয়া ঘরে বিনে ভাড়ায় বাসা বানাচ্ছে পোকা মিয়া। দেয়াল, ভেন্টিলেটার, জানালা, দরজার নিরাপদ স্থানে চাই কি টেবিল-চেয়ারেও ওদের অধিকার আছে বাসা বানাবার। গ্রামের কেন, শহরের অনেক মানুষ এখনো বিশ্বাস করে কুমরেপোকাদের মাটির তৈরি ঘর ভাঙতে নেই। ভাঙলে অমঙ্গল বা নিজের সুখের সংসার ভেঙ্গে দুঃখ-কষ্টে ভরে যাবে। কুমরেপোকরা নরোম মাটি দিয়ে ঘর বানায়। ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। বাচ্চার খাবারের অভাব দূর করতে পোকা-মাকড় ঢুকিয়ে মাটির ঘরের দুয়ার বন্ধ করে দেয় মা। বাচ্চা বড় হয়ে সেই মাটির দেয়াল ফুটো করে বাইরে বেরিয়ে আসে।

তো, কেমন করে ওরা দুনিয়ায় এলো? শোন তবে সেই কাহিনী। সেই হাজার বছর আগে নদীর তীরের কুমোর পাড়ায় ছিল এক হাড়-কিপটে কুমোর। সে কালে তো তামা-কাঁসা-এলোমিনিয়াম বা স্টিল ছিল না। কুমোরের মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিলই ছিল ভরসা। ওসব বিনে তো ঘর-সংসার চলে না। তাই বাজারে বিকোতো বেশ। আর কুমোরের মাটির কাজের ভার বেশির ভাগই ছিল মেয়েদের হাতে। বলতে গেলে ওরাই সংসারের লক্ষ্মী। তাই কুমোর-ঘরের মেয়েদের বিয়ের বাজারও ছিল বেশ চড়া। ভাল কাজ জানা মেয়ে হলে তো কথাই নেই। কাড়াকাড়ি লেগে যেতো কে নেবে ঘরের বৌ করে। সেই সুযোগটা ছাড়বে কেন মেয়ের বাপ? তাই বিয়ের নামে পণের টাকা হাঁকতো বিরাট অংক। এ যেনো মেয়ে বেচা-কেনার হাট।

সেই কিপটে কুমোর এক কাঁড়ি টাকা খরচা করে ঘরে এনেছে ছেলের বৌ। দারুণ সুন্দর মাটির কাজ জানা মেয়ে। কেবল হাঁড়ি-পাতিলই নয়, নক্সী করা ভাঁড়, পুতুল, কোনটা সে না পারে মাটি টিপে বানাতে? ওর হাতের তৈরি মাটির হরেক পদ নিয়ে শ্বশুর আর স্বামী যায় নৌকা করে দূরের হাট-বাজারে। এক প্রহরেই সব বিক্রি। এভাবে সংসারের আয় বেড়ে যায়। কিন্তু কিপটে শ্বশুরের টাকায় পেট ভরে না। স্বামীটাও কম যায় না। বাপের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বৌকে বলে, 'কাজ করো, কত টাকা পণ দিতে হয়েছে তোমার বাপকে, তা কি মনে আছে?'

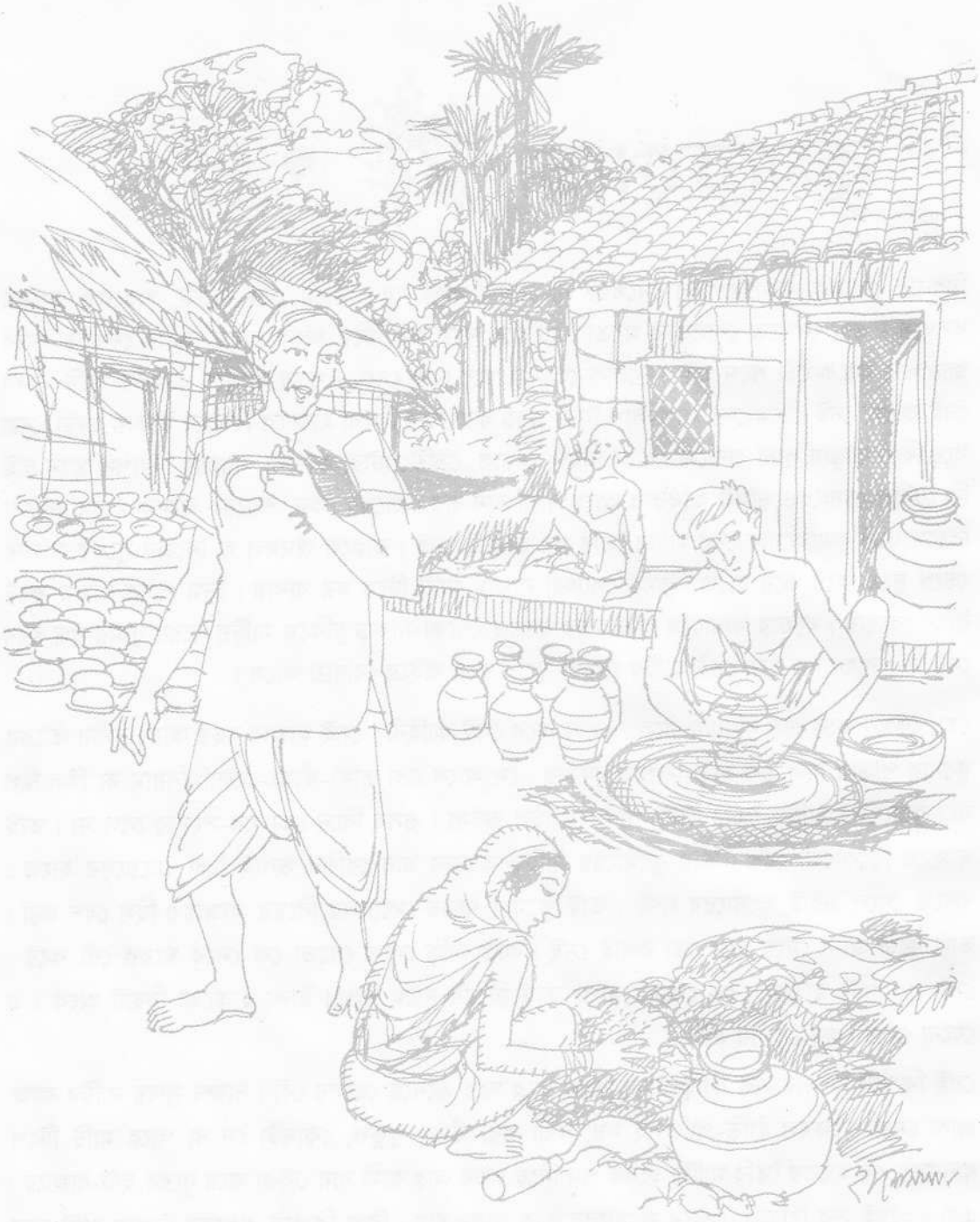

কাজ আর কাজ। দিন-রাত কেবলই কাজ। অবসর নেই নাওয়া-খাওয়া আর ঘুম-জিরোবার। মুখ ফুটে সে কিছুই বলে না। নীরবে কাঁদে আর কাজ করে। পুজো-পার্বণেও সুযোগ হয়না বাপের বাড়ি বেড়াবার।

বছর ঘুরে গেলে বাপ আসে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে। অনুমতি পায় না শ্বশুরের। জোর দাবি ও খাটাতে পারে না বেচারা বাপ। পণের টাকা তো কম নেয়নি। তাই চোখ মুছে বাড়ির পথে পা ফেলে কেবল যে মাটির কাজ তা তো নয়। একই সঙ্গে বৌকে রাঁধতে হয়। ধান ভানতে হয়। উঠোন ঝাট দিতে হয়। গোবর দিয়ে নিকোতে হয়। তবু বাড়ির লোকগুলো কেবলই বলে, 'হাটবার এসে যাচ্ছে, হাত চালাও বৌ, কাঁচা মাটির ভাঁড় পোড়াবে কখন?'

মেয়েকে বলে, 'কোজাগরি লক্ষ্মীপুজা গেল, কালী পুজা গেল, কার্ত্তিক পুজা গেল, অঘ্রানের নবান্ন গেল, পৌষ পার্বণও গেল, আর কবে তুই বাড়ি যাবি মা?'

'পণ নিয়েছ, বিয়ে দিয়েছ, মেয়েকে ভুলে যাও বাবা। আর কোনদিন এ গাঁয়ে এসোন না, বড় নিদয়া এ বাড়ির মানুষ,' বলতে বলতে মেয়ে কাঁদে আর বাপকে বিদায় করে।

পণ নিয়েছ ঝি দিয়েছ,
পাথর বান্ধ বুকে।
ঝিয়ের জ্বালা বড় জ্বালা
বিষ্টি নামে চোখে।

সে রাতে ঘুম আসে না কুমোর-বৌ'র। নীরবে কেঁদে কেটে বালিশ ভিজায়। পাশেই বেঘোরে ঘুমোয় ওর স্বামী। এক সময় বিছানায় ওঠে বসে বৌ। মনে মনে ভাবে আজ রাতেই এ বাড়ি ছেড়ে পালাবে সে। তাই সে চুপচাপ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। অন্ধকার উঠোন পেরোতেই মনে হয় কেউ বুঝি পিছু নিয়েছে তার। তাই দ্রুত পায়ে মাঠে নেমে আসে। এবারও মনে হয় পেছনে কেউ আসছে। এখন কী করবে কুমোর-বৌ? সে তার শ্বশুরের কাঁচামাটির ভাঁড় পোড়ানোর 'পুইন'বা গুহার মতো গর্তটার দিকে এগিয়ে যায়। চারদিকে মাটির শক্ত প্রলেপ দেয়া গর্তে তখনও গণগণে আগুন। গর্তের ভেতর পুড়ছে কাঁচামাটির হরেক রকম পাত্র। পাতিল পোড়ানোর 'পুইনের' খোলা মুখে দাঁড়াতেই পা ফসকে যায় ওর। আর কিনা তখন পুকুরের মতো গর্তে ঝুপ করে পড়ে যায় সে।

কাঁচা মাটির ভাঁড়ের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায় কুমোর-বৌ। এই অপঘাত মৃত্যুর ফলে কুমোর-বৌ হয়ে যায় কুমরেপোকা। সেই পোকা মাটির গোলাকার বাসা বানিয়ে চারদিক বন্ধ করে মানুষের চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে দিনের পর দিন। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর।

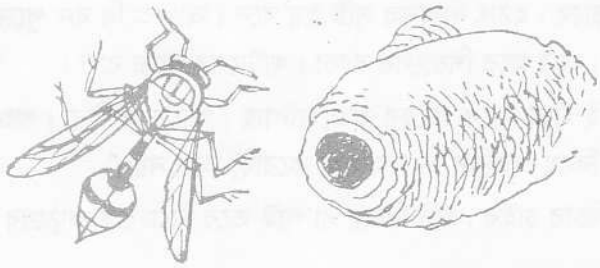

ঘুণপোকা

বলো দেখি কোথা থেকে এল ঘুণপোকারা? বুঝতে পারলে কোন পোকা? ওই তো খাটের ওপর শুয়ে আছো কিংবা চেয়ারে বসে পড়ছো, হঠাৎ শুনতে পাবে 'কড়ড় ..... কড়ড়..... কড়।' কোথা থেকে আসছে শব্দটা তা খুঁজে পেতে তোমার মাথা খাটাতে তো হবেই, কানের সতর্কতাও দরকার। এত সহজে পাবে না। যখন সনাক্ত করবে জাগাটা, তখন অবাক না হয়ে পারবে না। দেখবে একেবারে তোমার পাশে। দেখা কিন্তু পাবে না কোন করাতী কাঠের পরতের ভেতর বসে কড় কড় শব্দে কাঠ কেটে যাচ্ছে। একদিন হঠাৎ দেখবে, যাকে খুঁজেছ তুমি এদিক ওদিক কিন্তু দেখা পাওনি, সেই গোয়েন্দা পুলিশটি কাঠ ফুটো করে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন কখোন।

এত তুচ্ছ ভেব না ঘুণপোকাকে। সে হচ্ছে জাত কাঠুরের বংশধর। কী দাপট তার। বনের পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার কাউকে পাত্তা দেয় না সে। বন কেটে কেটে উজাড়। গাছেরা কাঁদে। বিনয় করে বলে, 'ও ভাই কাঠুরে, এবার থামো, আমাদের যে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবে।'

কে শোনে কার কথা। কাঠুরে ফিরেও তাকায় না। গাছের কথা কেন, সাপ, পশু-পাখি কারো কথাই সে গ্রাহ্য করে না। পাখিরা কান্নার রোল তোলে, 'আমরা বাসা বানাব কোথায়? ক্ষুধায় ফল দেবে কে?'

পশুরা হৈ চৈ করে বন শূণ্য হচ্ছে বলে। রাগে গর্জন করে বাঘ-সিংহ, 'পেয়েছে কী কাঠুরে? বনদেবীর পুজা দেয় বলে যাচ্চেতাই করে বেড়াবে?'

হ্যাঁ। কাঠুরে বনদেবীর ভক্ত বলে কথা। সে পুজো দেয় দেবীকে বনের মাঝখানে। দেবীর সুনাম গায় বনে বনে। তার বিশ্বাস যে যাই বলুক বনদেবী তাকে কিস্‌সু বলবে না।

মুসকিল বাধাল আকাশের মেঘ। বর্ষায় সে জল দিলো না তেমন। বর্ষা গেলে তার দেখাই নেই। ওই সমুদ্র আর পর্বত মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ভুলে গেছে এদিকটা। ফেরার নামই নেই। সুযোগটা পেয়েছে সূর্য। সে চেতিয়ে নামে বনের ভেতর। মাটি শুকায়। গরম আর তৃষ্ণায় মরে বনের পশুপাশি। গাছেরা কাঁদে খাদ্যের অভাবে। হঠাৎ দাবানল সৃষ্টি হয় বনে। আধাআধি বন পুড়ে ছাই। আগুনে পুড়ে মরে কাকের ছা, ঘুঘুর ছা। আর মরে শিয়ালের বাচ্চা। খাটাশের বুড়ো বাপ।

আর তো সহ্য হয় না। তাই সভা ডাকে গাছের রাজা বটগাছ। আসে পাখিরা। পশুরা। সিংহ গর্জন করে বলে, 'বনদেবীর দিকে তাকিয়ে এতদিন অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।'

বাঘ বলে, 'দেবীর কাছে বিচার চাইব। যদি বিচার না পাই তবে নিজেরাই কাঠুরের সাজা দেব।'

সেই মতে সবাই বনদেবীর কাছে ছুটে যায় যে যার দুঃখের কথা বলে ফরিয়াদ জানায় দেবীর কাছে। দেবী ভেবে দেখেন যদি সঠিক বিচার না হয়, তবে কেউ তাকে আর গ্রাহ্য করবে না। স্বীকার করবে না তার মহিমা। দেবী এবার ডেকে আনেন কাঠুরেকে। কুড়াল হাতে আসে কাঠুরে। নিজের সব কর্মই স্বীকার করে সে। কিন্তু দেবীর আদেশ মান্য করে নিজের অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে রাজি নয়। এই অবাধ্যতার জন্য দেবী অভিশাপ দেন কাঠুরেকে, 'তুই হয়ে যা ঘুণপোক। আর কখনো কাঁচাকাঠ কাটতে পারবি না তুই। পচা কাঠ খেয়ে জীবন কাটবে তোর।'

বনদেবীর অভিশাপে সঙ্গে সঙ্গে কাঠুরে মানুষরূপ পাল্টে হয়ে যায় ঘুণপোকা। পচা কাঠেই তার জন্ম। ওখানেই কাটে জীবন। মরণ ও হয় ওই পচা কাঠের গর্তে।

কাঠুরে তুই,কাঠুরে তুই
কাঠের ভিতর করিস কি?
কাঠ কেটে জীবন কাটালি
বাকি রাখলি কি?

গুবরেপোকা

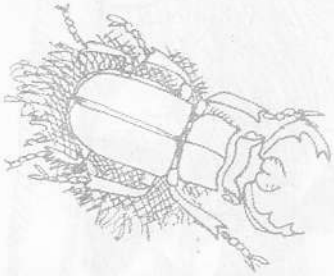

গরুর মল বা গোবর যে মূলবান জৈবসার একথা তোমরা জান। রাসায়নিক সার মাটিতে শুধু নয়, ফসলের ভেতরও বিষ ছড়ায়। মানুষ সে সব খায় আর নিজের ক্ষতি করে। অথচ দেখো গোবরসার মানুষের উপকার ছাড়া কোন ক্ষতি করে না। সেই গোবরকে কেন্দ্র করেই ঘুঁটেকুড়ানি আর ফসলের বিবাদ শুরু। পরিণামে জন্ম হয় গুবরেপোকার। শুনে অবাক লাগছে তো? এ আবার কেমন কথা, তাই না? তবে শোন।

ওই যে ঘুঁটেকুড়ানি– বুড়ি, তার তো একটাই কাজ। গরুর পেছনে মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুঁটে কুড়ানো। বেচারীর কী দোষ বলো? বুড়ো গেছে মরে। ঘরে ছেলে বৌ'র রাজত্ব। ছেলে তো বৌ নাওটা। মায়ের দুঃখ বুঝতে চায় না। কেবল যোগায় বৌ'র মন। তাই বিনে কাজে শাশুড়িকে এক বেলাও খেতে দেয় না বৌটা। দজ্জাল বলে কথা।

'শকুনের হায়াৎ পেয়েছ বুড়ি, মরে না ক্যান?' ঠিক এমনি ধারার কথা বলে বৌ তার শাশুড়িকে। বয়স হয়েছে, শরীরে কুলোয় না। তবু বাঁকা কোমর টেনে ঝাঁকা হাতে সারাদিন বুড়িকে ঘুঁটে কুড়াতে হয়। সেই ঘুঁটেতে ভাত রান্না করে ছেলের বৌ। মোটেই শাশুড়ির দুঃখটা বুঝতে চায় না।

এদিকে হলো কী দ্যাখো। মাঠের ফসলেরা বুড়ির উপর চটে যায়। ধান গাছ বুড়িকে ডেকে বলে, 'অ বুড়ি, আমাদের মুখের গ্রাস তুলে নিস ক্যানো?'

পাট গাছ মাথা নেড়ে নেড়ে বলে ঃ

'বুড়ি গো বুড়ি
বয়স হলো পাঁচ কুড়ি,
কোমর হলো বাঁকা
সেইখানে ঘুঁটের ঝাঁকা।'

ঘুঁটেকুড়ানি-বুড়ি রাগে গজগজ করে। ধান গাছ আর পাট গাছের কথার উত্তর দেয় না। গরুর পেছনে হাঁটে আর ঝাঁকায় তোলে শুকনো ঘুঁটে। ধান গাছ আর পাট গাছেরা ফন্দি আটে। তারা মাঠে চরতে আসা জোয়ান ষাঁড়ের সঙ্গে যুক্তি করে। বুঝিয়ে বলে, 'ঘুঁটেকুড়ানি যদি সব গোবর-ঘুঁটে কুড়িয়ে নেয় তবে গোবাটে জন্মাবে না ঘাস, জমিনে ফলবে না ধান। তখন তুই খড়-বিচোলি পাবি কোথায়?'

ষাঁড়টা ভাবে, কথাটা তো মিছে নয়। ঘুঁটে-গোবর ছাড়া কী মাঠে ঘাস জন্মে? জন্মে কী জমিনে ধান? যেই ভাবনা সেই কাজ। খেপাটে ষাঁড় ছুটে গিয়ে পেছনের পা দিয়ে বুড়িকে সজোরে মারে লাথি। দম আটকে ঘুঁটেকুড়ানি যায় মরে। ষাঁড়ের লাথিতে মরে যাওয়া ঘঁটেকুড়ানি কী স্বর্গে যাবে? তাই সে হয়ে যায় গুবরেপোকা। গোবরের স্তূপে তার বাস। গোবর তার খাদ্য।

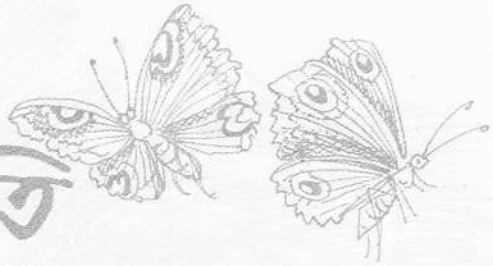

প্রজাপতি

এই যে রঙ-বেরঙের প্রজাপতিকে ফুলে ফুলে উড়তে দেখে খুশিতে আটখানা হয়ে যাও তোমরা, একবারও কি ভেবেছ ওরা দুনিয়ায় এলো কি করে? লাল, হলুদ, সবুজ কত না বাহারী প্রজাপতি। বিচিত্র নক্সার পাখা তাদের পিঠে। ফুলের মৌসুমে কোথা থেকে আসে তারা? এতদিন ছিল কোথায়?

ওই যে, রাজার ১০ বছর বয়সের ফুটফুটে কিশোরী মেয়েটা। চঞ্চল আর কাকে বলে। সারা দিন রাজবাড়ির বাগানে ঘুরে বেড়ায়। ইচ্ছে হলো তো নির্দয়ের মতো গাছের ফুল ছিঁড়ে। পাতা ছিঁড়ে। ফুলের পাঁপড়ি ছড়িয়ে দেয় সারা বাগানে। কারো কিসসু বলার নেই। রাজার আদুরে মেয়ে বলে কথা।

বড় সমস্যায় পড়ে পরীরা সব। জোছনা পড়া রাতে বাগানে নেমে এসে দুঃখে কাঁদে তারা। ফুল ফুটাবে কী? গাছে কলি থাকলে তো ফুটাবে ফুল। পরীদের দুঃখে কাঁদে বাগানের যত ফুলগাছ। ফুলগাছ আর পরীরা আলোচনায় বসে কি করে রাজকন্যাকে বশে আনা যায়। তারা কোন উপায় খুঁজে পায় না। শেষে ডাকা হয় মৌমাছিকে। চাঁপাগাছ জানতে চায়, 'ভাই মৌমাছি, তুমি কি পার না হুল ফুটিয়ে রাজকন্যাকে বাগান থেকে দূরে রাখতে?'

মৌমাছি বলে,'তা কি হয় বলো? রাজার লোকেরা জাল দিয়ে ধরে আমাদের একটি একটি করে গরম পানিতে সেদ্ধ করে মারবে।'

কামিনী গাছ মাথা নাড়িয়ে বলে, 'আমরা যারা গাছ-গাছালি তারা তো হাঁটতে পারি না, তোমরা যারা হাঁটতে-উড়তে পারো তারা মহারাজার কাছে নালিশ করে এসো।'

ধারেই ছিল মৌটুসি পাখি। লম্বা ঠোঁট নেড়ে সে বলে, 'তোমরা ভয় পাচ্ছ, পাও। আমিই যাব মহারাজের কাছে। এর একটা বিহিত না হলে ফুল-মধুর অভাবে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যে আমি মরব।'

শেষটায় মৌটুসিই গেল মহারাজের কাছে। মহারাজ কোন কথাই শুনতে নারাজ। তার কথা হচ্ছে রাজকন্যার জন্যই তিনি গড়েছেন ফুল বাগান। ওখানে যেমন ইচ্ছে তেমন করবে রাজকন্যা। কেবল তাই নয়। রেগে গিয়ে মহারাজ বললেন, 'পরীরা বাগান-রাজ্যে গোলমাল পাকাচ্ছে। তাদের ধরে ডানা কেটে চাকর-নফরদের সঙ্গে বে দেব।'

দুঃখ নিয়ে ফিরে আসে মৌটুসি। সব বৃত্তান্ত খুলে বলে সে গাছ, পাখি আর মৌমাছিদের। রাতের বেলা পরীরা এলে গাছেরা কেঁদে কেটে ঘটনার বিবরণ দেয়।

পরীরা আটে ফন্দি। সেই মতে তারা গভীর রাতে রাজকন্যার ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত কন্যার বিছানায় বসে কালঘুমের গান গায়,

রাজা ঘুমালো, রানী ঘুমালো
পরীরা সব জাগে।
রাজকন্যার কালঘুম
গাছেরা সব জাগে।

কালঘুমে অচেতন রাজকন্যাকে সোনার পালঙ্ক সমেত পরীরা তুলে নিয়ে যায় তাদের রাজ্যে। ঘুমন্ত রাজকন্যাকে গোলাপ জলে স্নান করায় পরীরা। নিজেদের ঝরে পড়া পালক দিয়ে বানায় দুটো পাখা। সেই পাখা জুড়ে দেয় রাজকন্যার পিঠে। পাখায় রঙ-বেরঙের নক্সা করে তারা। এভাবে ধীরে ধীরে, রাজকন্যার শরীরকে পরীরা বানায় প্রজাপতির শরীর। তারপর পেট পূর্ণ করে ফুলের মৌ খাইয়ে রাত পোহাবার পূর্বে ফিরিয়ে দিয়ে আসে রাজবাড়ি।

রাত পোহালে মেয়েকে ঘুম থেকে জাগাতে গিয়ে রাজা-রানী দেখেন সোনার পালঙ্কে রাজকন্যা নেই। ওখানে বসে আছে অপূর্ব সুন্দর এক প্রজাপতি। সেই প্রজাপতি উড়তে উড়তে জানালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে,

বিদায় দাও গো বাবা-মা, যাই গো মৌবনে
আমি হই রাজকন্যা দেখা পাবে ফুলবনে।
ফুলকন্যারা ডাকছে আমায় আয়-আয়
মৌমাছিরা ফুলে ফুলে মধু খেয়ে যায়।

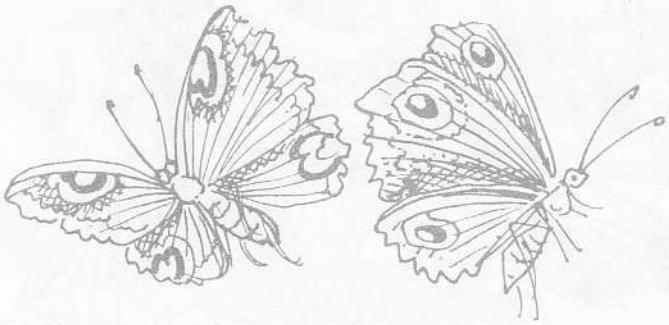

গুটিপোকা

স্কুলের পাঠ্য কৃষিবিজ্ঞানে তোমরা নিশ্চয়ই গুটিপোকা বা রেশমকীট সম্পর্কে পাঠ নিয়ে থাকবে। কিন্তু ওই পোকা যে একদিন তোমাদের মতো মানুষ ছিল, সে কথা কি জান? আরে বাবা, ছিল বৈ কি। ছিলই তো। আহা কি দুঃখের কথা! শুনলে কষ্ট পাবে মনে। আক্ষেপ করবে। তবে শোন।

গরীব তো গরীব, হদ্দ গরীব তাঁতি। জমি-জমা নেই। তাঁতে কাপড় বুনে দিন যায়। রাত কাটে। কপাল মন্দ। বুড়ি মা যায় মরে। মহা মুসকিলে পড়ে তাঁতি। এতদিন মা ছিলেন। বাড়ি ঘিরে লাগানো কার্পাস গাছ থেকে তুলে আনতেন তুলা।সেই তুলা থেকে কালো দানার মতো বীচিগুলো টেনেটেনে ছাড়াতেন। খাটা খাটুনি কি কম? তারপর চরকায় ঘুরিয়ে বানাতেন কাপড় বুননের সুতো। তবেই না সে সুতো রঙ দিয়ে রোদে শুকিয়ে তাঁতে তুলে তাঁতি বানাতো কাপড়।

একা একা এখন আর দশ দিক সামাল দিতে পারে না তাঁতি। এদিক হলে ওদিক হয় না। তা'ছাড়া তৈরি কাপড় নিয়ে হাটে যাও রে। নিজ হাতে চুলো গুতিয়ে রান্না করো রে। বুঝ ক্যামন ঠ্যালা। তাঁতি ভেবেছিল দুটো পয়সা জমিয়ে ভাল একখানা ঘর তুলে তবেই করবে বে। তা আর হলো কই। তিন-চারটে গাঁ ঘুরে মেয়ে তালাসের সময়ও নেই তার। তাই খোঁজ খবর অতটা নিতে পারেনি তাঁতি। বিয়ে করে ঘরে তোলে বৌ। দুটো দিন যেতেই তাঁতি বুঝে ফেলে বৌটা মনমতো হয়নি। কুঁড়ে। কিন্তু তাঁতী ঘরের বৌ-ঝি কি আর কুঁড়ে-অলস হলে চলে?

খুব ভোর বেলা ওঠে তাঁতি বসে যায় তাঁতে। মাকু চলে খটাখট। তাঁতি বৌ তখনো ঘুমে। তাঁতি ডেকে কয়, 'ও বউ, রাত কি এখনো পোহায়নি? কখন বিছানা ছাড়বে গো রাজকন্যে? কখন সেদ্ধ করবে চাল? কখন যাবে তুলো গাছে তুলো কুড়াতে?'

হাই তোলে তাঁতি বৌ। চোখ কচলে বলে,

ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী স্বপ্নে এসেছে
তাঁতির ঘরে তাঁতির দোরে জোনাকী জ্বলেছে,
ও জোনাকী, ও জোনাকী বল কে বলেছে
তাঁতির ঘরের মাটির তলায় হীরক রয়েছে?

বৌ'র কথায় হাসে তাঁতি। বুঝতে পারে কুঁড়ে বৌ ঘরে বসে বসে সোনা-হীরকের স্বপ্ন দেখে। তাই সে রাগ করে বলে,'জলদি কাজে যা বৌ, খামখা মেজাজ গরম হতে দিস না।'

কুঁড়ে বলে কথা। ঘরের কোণে রয়েছে কার্পাস গাছ থেকে তুলে আনা তুলোর স্তূপ। সেই তুলোয় সুতো আর হয় না। সুতোর অভাবে ঠিক মতো তাঁত চালাতে পারে না তাঁতি। কাপড় হয় না বোনা। তাই সে বৌ'র কুঁড়েমি ভাঙতে রোজ সকালে এক চোট পিটুনি ঝাড়ে। সেই পিটুনি খেয়ে কুঁড়েমির কথা ভুলে যায় তাঁতি-বৌ। তুলো ক্ষেতে পড়ে থাকে এক দুপুর। আর এক দুপুর খাটে চরকার পেছনে। মনে মনে বেজায় খুশি হয় তাঁতি। যে দেবতার যে মন্ত্র।

এদিকে হলো কি দ্যাখো। রোজ রোজ পিটুনি খেয়ে তাঁতি বৌ'র হাড়-মাংস এক হবার পালা। বৌটা আর সইতে পারে না। মনে মনে ভাবে সুযোগ পেলেই পালিয়ে যাবে বাপের বাড়ি। আসছে হাটবার স্বামী যখন কাপড় নিয়ে হাটে চলে যাবে সেই সুযোগে পালাবে সে। কিন্তু হাটবার ঘুরে আসতে আরো চারদিন বাকি। এই চারটে দিন ভোর বেলাকার পিটুনি থেকে বাঁচবে কেমন করে?

তাঁতি বৌ ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই খুব সাবধানে বিছানা ছাড়ে। এতটুকু টের পায় না তাঁতি। ঘরের কোণে স্তূপ দিয়ে রাখা তুলোর ভেতর গর্তের মতো করে ঢুকে পড়ে সে। ঘুম থেকে জেগে তাঁতি তাকে খুঁজে না পেয়ে নিশ্চয়ই তখন হাত দেবে কাপড় বোনার কাজে। বেঁচে যাবে পিটুনি থেকে। মন্দ কি ফন্দিটা?

ঘুম ভাঙলে তাঁতি আলসে বৌকে বিছানায় দেখতে পায় না। মনে মনে খুশি হয় তাঁতি। যাক, এতদিনে পিটুনির দাওয়াই খেয়ে কুঁড়েমির বিমার সেরে গেছে বৌ'র। নিশ্চয়ই সে এখন তুলো গাছে গেছে তুলো কুড়াতে। কাণ্ডখানা দেখো। তুলোর স্তূপের ভেতর গুটি পাকিয়ে পড়ে থাকা তাঁতি বৌ'র দম যায় যায় অবস্থা। না পারে সে বেরিয়ে আসতে, না পারে দম নিতে। অপেক্ষায় থাকে কখন তাঁতি তাঁতঘরে ঢুকবে। তাঁতে হাত দেবার আগে তাঁতি হুঁকো টানতে বসে। হুঁকো টানা আর শেষ হয় না। কতক্ষণ পারে তাঁতি বৌ দম আটকে রাখতে? তাই তো দম আটকে যায় মরে। তাঁতি বৌ মরে গিয়ে হয়ে যায় গুটিপোকা। চারদিকে তুলো প্যাচানো শক্ত গুটি। মধ্যখানে পোকা।

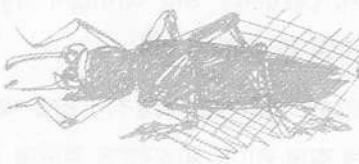

ঝিঁঝি পোকা

নিশ্চয়ই অনেক পোকা-মাকড়ের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। কিন্তু ঝিঁঝিপোকার সঙ্গে পরিচিত হওয়া সহজ নয়। না, আমি সেই ঝিঁঝির কথা বলছি না যারা রাতের বেলায় মাঠে-ঝোপে একটানা ডেকে যায়। এ ঝিঁঝিপোকার নিবাস বন কিংবা ঘন ছায়ার পুরনো গাছ। ওরা জন্মে প্রাচীন গাছের পচা ছাল-বাকলে। ফালগুনে ওদের ডাক শোনা যায়। বর্ষা এলে থেমে যায় ডাক। সেই ঝিঁঝিপোকার গায়ের বর্ণ হালকা সবুজ। অপূর্ব সুন্দর। তো ওরা এলো কি করে দুনিয়ায়? দুঃখের সেই কাহিনী বটে। শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি? শোন তাহলে।

গাঁয়ের এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে ঘুরে কৃষকের লাঙল বানায় যে বুড়ো ছুতোর, একদিন বুকে দম আটকে মরে গেল সে। বড় সহজ কাজ নয় আস্তো গাছের কাণ্ড কেটে লাঙল বানানো। এই বুড়ো বয়সে শক্ত কাজের ধকল সইল না বুড়ো। বুড়ি হলো বিধবা। ছেলে নেই। একটা মাত্র মেয়ে। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে ক'বছর পূর্বে। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা আর জমাই ষষ্ঠীর দিনেই বাপের বাড়ি বেড়াতে আসে মেয়ে। বাপ মরার পর এই প্রথম আসছে জমাই ষষ্ঠী। মেয়ে অপেক্ষায় থাকে কখন মা জমাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন দিতে লোক পাঠান। বিধবা মায়েরও খুব ইচ্ছে ষষ্ঠী পূজার দিন নেমন্তন্ন পেয়ে জামাই আসবে শাশুড়ির দেয়া কাপড় পরতে। আসবে মেয়েটা। মায়ের দেয়া ষষ্ঠী-দিনের শাড়ি পেয়ে খুশি হবে। পড়শীরা ধুমধাম করে কাপড় দিচ্ছে জামাইকে। মন্ডা-মিঠাই নিয়ে ঘরে আসে জামাই। বিধবা ছুতোর বৌ'র পোড়া কপাল। এমনি চলে দিন খেয়ে না খেয়ে। তার ওপর ষষ্ঠী আসছে।

না। কোন ভাবেই জামাইয়ের জন্য কাপড় কেনা হয়না বুড়ির। জোলাপাড়া গিয়ে শত অনুরোধ করেও কাপড় পায়না বাকিতে। জোলারা জানে বাকিতে কাপড় দিলে কোনদিন দেনা শোধ করতে পারবে না বুড়ি। মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে জামাই-বাড়ি লোক পাঠায় শাশুড়ি। এই ষষ্ঠীতে কাপড় দেয়া সম্ভব নয়। তাই আসছে অম্বুবাচিতে বাদ যাবে না।

জামাই রাগ করে। মেয়েটা লজ্জা পায়। ষষ্ঠীর দিনও ফুরোয়। আসছে অম্বুবাচি তিথি। গাঁয়ের এক তাঁতি-জোলার ফেলনা ভাঙা তাঁতে নিজ হাতে কাপড় বুনতে বসে বুড়ি। নিজের গাছের কার্পাস তুলো আর জোলাদের ফেলনা তুলো দিয়ে ভাঙা তাঁতে কাপড় বোনে বুড়ি শাশুড়ি। দিন যায়। কাপড় বোনা শেষ হয় না। আসে অম্বুবাচি তিথি। তাও আধা-আধি কাপড় বোনা হলো না। তাই জমাইকে আর কাপড় দেয়া হলো না বুঝি।

জ্যৈষ্ঠের ষষ্ঠী গেল। আষাঢ়ের অম্বুবাচি তিথিও যায় যায়। দিন গিয়ে সন্ধ্যা নামে। ফুরিয়ে যায় তিথি। কি লজ্জা! কি শরম! এ মুখ দেখাবে কেমন করে জামাই আর মেয়েকে? তাই আষাঢ়ের অম্বুবাচি তিথির রাতে বিছানায় পড়ে কাঁদে শাশুড়ি। কান্নায় ভিজে বালিশ। নামে মুষলধারায় বৃষ্টি।

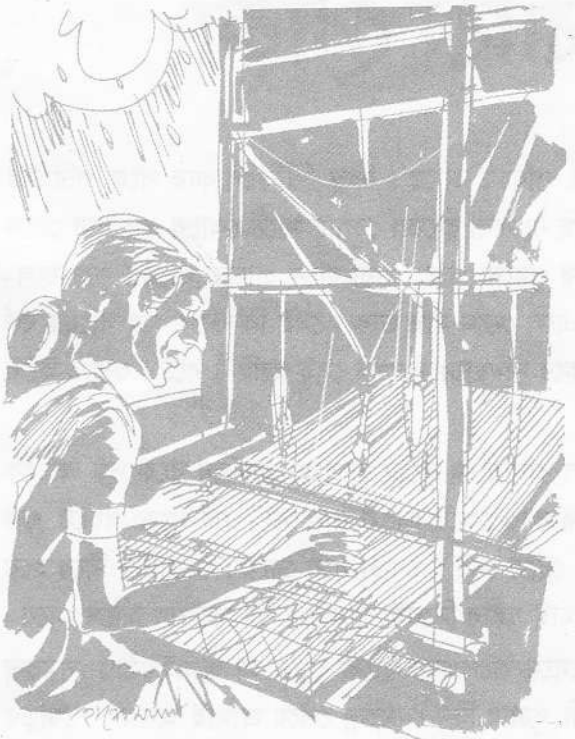

আষাঢ়ের বৃষ্টি-ঝরা অন্ধকার রাত আরো বাড়ে। দুঃখে আর লাজে মাঝরাতে কান্নার ভেতর মৃত্যু ঘটে ছুতোর বুড়ির। ফাগুন এলে ঝিঁঝিপোকা হয়ে জন্মে সে। সেই ঝিঁঝিপোকা বাড়ির সবচেয়ে পুরনো আম গাছের পচা বাকলের ফাঁকে বসে ডাকে, ঝিন্.... ঝিন্.... ঝিন্... ঝিন্.... ঝিনো..... ও..... ও ....। জৈষ্ঠ্যে জমাই ষষ্ঠী ব্রত সামনে রেখে আষাঢ়ের অম্বুবাচি তিথি পর্যন্ত ঝিঁঝি পোকা কাপড় বোনে তাঁতে বসে জামাইয়ের জন্য। অবিকল তাঁতের 'শানা' আর 'ব' টানার মতো শব্দ, ঝিন.... ঝিন্.... । অম্বুবাচি ফুরালে থেমে যায় সেই ঘুমপাড়ানী শব্দ। কোন দিন ষষ্ঠীর দিনে জামাইকে কাপড় দেয়া হবে কি অভাগী শাশুড়ির?

ঝিঁঝিপোকা ঝিঁঝিপোকা
আম ফলেছে থোকা থোকা।
মায়ে কান্দে ঝিয়ে কান্দে
জামাই ধরে বায়না।
ভাঙ্গা তাঁতে বুননি কাপড়
ছেঁড়া সুতা জোড়া নেয় না।
ষষ্ঠী গেল, গেল অম্বুবাচির রাত
পোড়া কপালীর এই ছিল বরাত ॥

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
পাঠাগার: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

পাখি ও পতঙ্গরা যখন মানুষ ছিল

বইটির ভিতরের গল্পগুলো নিছক শিশু-কিশোর বিনোদনের কল্পকাহিনী নয়; বড়দেরও ভাববার বিষয়। প্রতিটি কাহিনীর ভিতর লুকিয়ে আছে সুপ্রাচীন দূরঅতীত-বাঙলার জনজীবনের সুখ-দুঃখ আর স্বপ্নের কথামালা। কৃষিভিত্তিক এই প্রাচীন জনগোষ্ঠী যে ক্ষুধা-দারিদ্র আর টিকে থাকার সংগ্রামের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ যাত্রা শেষে আজ আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছে, গল্পগুলোর গভীরে তার ইংগিত মিলে। শিশুরা বুঝতে পারবে তাদের পূর্বপুরুষদের জীবন কতটা কষ্টকর ছিল। সেকালে মানুষের জীবন যে পাখি আর পতঙ্গের চেয়ে উচ্চতর ছিলনা, তারই প্রমাণ এই কাহিনীগুলো। এসব কাহিনী কেবল রূপকথা নয়; বরং রূপকের আড়ালে মানষের বাস্তব জীবনগাঁথা। কাহিনীগুলোর কাঠামো আমার কৈশোরে গল্প শোনা সময়েরই অংশ। স্বপ্নময় সে জীবনে বিস্ময়ের সঙ্গে কানপেতে শোনা সে সব কাহিনীতে আমার নিজস্ব কল্পনার রঙ যে মিশেনি, এমন নয়। তারপরও ওরা আমাদের ঐতিহ্য, সাহিত্যের শিকড়।

হরিপদ দত্ত
জুলাই ২০০৩

সেকায়েপ
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।
বিক্রির জন্য নয়